ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

০৩ অক্টোবর ২০১৩

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপার্সন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা

মাহ্‌ফুজুল হক, গবেষণা সহযোগী, জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প
মহুয়া রউফ, সহকারি প্রকল্প সমন্বয়ক-গবেষণা, জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প
মু. জাকির হোসেন খান, প্রকল্প সমন্বয়ক, জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প

ISBN: 978-984-33-7990-0

কৃতজ্ঞতা
খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং সম্পাদনায় সহায়তার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার* এম. ওয়াহিদ আলম এবং প্রতিবেদনের ওপর মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ:
জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প (সিএফজিপি)
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
রোড # ৫, বাসা # ৭ (২য় তলা)
ব্লক # এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৯২৮১৭
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৯২৮১৭
ই-মেইল: cfgp@ti-bangladesh.org
zhkhan@ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা বৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০১৩ অনুযায়ী, আগামী ২০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিতে অবস্থানকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ স্থান সবার শীর্ষে। তাই, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রাপ্ত জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং সেগুলো উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভার্নেন্স প্রকল্পের (সিএফজিপি) আওতায় টিআইবি'র চলমান গবেষণার অংশ হিসেবে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। জলবায়ু বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়ন, নির্বাচন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সমূহ সুপারিশ করা হয়েছে এ গবেষণাটিতে।

টিআইবি'র মূল লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক, জবাবদিহিতাসম্পন্ন ও সুশাসন সহায়ক একটি কাঠামো তৈরী ও তাকে সমৃদ্ধতর করায় সহায়ক ভূমিকা পালন করা যেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সংগৃহীত তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এর ফলে একদিকে যেমন জাতীয় পর্যায়ে এ খাতে বরাদ্দের উপর জনগণের আস্থা বাড়বে, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশ সমূহ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্য অধিকতর অর্থ লাভের পথ সুগম হবে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুত অর্থ স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্য উন্নয়ন সহায়তা বা ঋণ সহায়তার "অতিরিক্ত" ও "নতুন" তহবিল হিসেবে আসলেই আসছে কিনা এবং উক্ত তহবিলের ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কতটুকু নিশ্চিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণও টিআইবি'র উদ্দেশ্য।

টিআইবি'র ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভার্নেন্স প্রকল্পের সমন্বয়ক মু. জাকির হোসেন খানের নেতৃত্বে এ গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ে থেকে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে যুক্ত ছিলেন মহুয়া রউফ এবং মো: মাহ্‌ফুজুল হক। এছাড়াও টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক, গবেষণা বিভাগের পরিচালক এবং উর্ধ্বতন গবেষকসহ অন্যান্য সহকর্মীরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

টিআইবি'র অন্যান্য গবেষণার মতো শুরু থেকেই এ গবেষণায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস ছিল। জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পে সুশাসন নিরূপণে গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এ অনুসন্ধানমূলক গবেষণাটি করা হয়েছে। তথ্যের প্রত্যক্ষ উৎস হিসাবে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা, হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ, প্রকল্প স্থান সরেজমিন পরিদর্শন, মুখ্য তথ্যদাতা ও প্রকল্পসংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার এবং মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া তথ্যের পরোক্ষ উৎস হিসেবে গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্র পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহিত তথ্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। টিআইবি'র পক্ষ থেকে তাই সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমরা আশা করি এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য জলবায়ু তহবিলের কার্যকর ব্যবহার, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম হবে এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো থেকে উত্তরণের জন্য দিক নির্দেশনা পেতে সহায়তা করবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে যেকোনো পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

সূচীপত্র

১. প্রেক্ষাপট ৪
২. গবেষণার উদ্দেশ্য ৫
৩. গবেষণার পরিধি ৫
৪. গবেষণা পদ্ধতি ৫
৫. বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল হতে অর্থায়নে অগ্রগতি ৯
৬. বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ-এর সহায়তাপুষ্ট সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন পর্যবেক্ষণ ১২
৭. এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ২২
৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৪২
৯. সুপারিশমালা ৪২
তথ্য সূত্র ৪৩

চিত্র সূচী

চিত্র ১: বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের প্রবাহ ৯
চিত্র ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগ অনুযায়ী বাংলাদেশে সার্বিক অর্থায়ন ১০
চিত্র ৩: তহবিলের উৎসভেদে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তহবিল প্রাপ্তি ১১
চিত্র ৪: বিসিসিআরএফ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বোর্ড ১৪
চিত্র ৫: এনজিও তহবিল বরাদ্দের অগ্রাধিকার খাত/থিম ২৩
চিত্র ৬: নির্বাচিত এনজিও'র কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ৩০

সারণি সূচী

সারণি ১: গবেষণায় বিবেচিত নির্ধারক সমূহ ৬
সারণি ২: প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য ১২
সারণি ৩: বিআইডব্লিউটিএ'র প্রকল্প প্রস্তাব, আর্থিক প্রতিবেদন এবং টিআইবি জরিপের তুলনা ২০
সারণি ৪: বিআইডব্লিউটিএ'র অবস্থান এবং টিআইবি গবেষণার তুলনা ২১
সারণি ৫: বিসিসিটিএফ থেকে নির্বাচিত এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনিয়ম ২৭
সারণি ৬: নির্বাচিত এনজিও'র কর্ম অগ্রাধিকার ২৮
সারণি ৭: এনজিও'র অভিজ্ঞতা ২৯

১. প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল প্রকার উন্নয়ন, অগ্রগতি, দারিদ্র্য বিমোচন উদ্যোগ, নিরাপত্তা এবং অস্তিত্বের জন্য প্রধান হুমকি। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হওয়ায় ভবিষ্যতে এর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হওয়ার আশংকা প্রকট। বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০১৩ অনুযায়ী, আগামী ২০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিতে অবস্থানকারী প্রধান দেশ হলো বাংলাদেশ (জার্মানওয়াচ, ২০১৩)। এছাড়াও ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি মনিটরিং রিপোর্ট ২০১১-এ বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে অবস্থানকারী "উত্তপ্ত ক্ষেত্র" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘূর্ণিঝড়ের কারণে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বছরে অতিরিক্ত গড়ে ৬ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে প্রতিবেদনটি পূর্বাভাস দিয়েছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ঝুঁকিতে নিপতিত বিভিন্ন দেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহীত অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন। এ পরিপ্রেক্ষিতে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) আইন ২০১০-এর আওতায় বিসিসিটিএফ গঠনের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অভিজ্ঞ এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাকে প্রকল্প ও কর্মসূচী বাবদ অর্থায়নের বিধান রাখা হয়, এবং বাংলাদেশ সরকার এর রাজস্ব বাজেট হতে বিসিসিটিএফ'কে এ ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করেছে। শিল্পোন্নত অ্যানেক্স-১ ভূক্ত দেশগুলো বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ)-এ জুন ২০১৩ পর্যন্ত ১৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে।

ইতিমধ্যে বিসিসিটিএফ হতে যেসব এনজিও-কে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, তাদের নির্বাচন করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, বরাদ্দ প্রাপ্ত এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেশকিছু এনজিও'র সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাব, সরকার কর্তৃক প্রণীত এনজিও নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ না করা ইত্যাদি অভিযোগ উঠেছে। ফলে, তহবিলের অর্থ সত্যিকারের বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে না পৌঁছানোর ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ ও অন্যান্য জলবায়ু তহবিল হতে অর্থায়নের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোতে সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা খুবই জরুরি।

১.১ জলবায়ু তহবিলে বাস্তবায়িত প্রকল্প পর্যবেক্ষণ যৌক্তিকতা

"বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন"-এর মতে একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং অপরীক্ষিত অর্থায়নের ক্ষেত্র বিধায় জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনা এবং এর সুশাসনের ঝুঁকি নিরূপণে সুনির্দিষ্ট ধারণাও অনুপস্থিত। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রণীত "ক্লাইমেট পাবলিক এক্সপিন্ডিচার এন্ড ইনষ্টিটিউশনাল রিভিউ ২০১২" প্রতিবেদনে বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জলবায়ু বাজেটে বাস্তবায়িত প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে জোর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড ও বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড সংক্রান্ত আইনী কাঠামো ও নীতিমালার আওতায় তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা, স্বাতন্ত্র্য এবং সক্ষমতার ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে টিআইবি কর্তৃক "জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়" নামক একটি কার্যপত্র গত ৯ এপ্রিল ২০১২ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল গোষ্ঠির সাথে আয়োজিত একটি মতবিনিময় সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে, প্রকল্প বাছাই এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যের (যেমন, চুক্তি,স্মারক ইত্যাদি) ঘাটতি, আইনের অপর্যাপ্ত প্রয়োগ,

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্ভাব্য অনিয়ম ও জবাবদিহিতার অভাব ইত্যাদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তরে সুশাসনের ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয় (টিআইবি, ২০১২)।

তবে, বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নে এনজিওদের দক্ষতা, সামর্থ্য ও সক্ষমতা নিরূপণে উল্লেখযোগ্য গবেষণা অনুপস্থিত। টিআইবির মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক অনুসন্ধানে বিসিসিটিএফ-এর অর্থায়নের জন্য নির্বাচিত এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাবের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সততা, স্বচ্ছতা, সামর্থ্য/দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির উপকার প্রাপ্তি নিরূপণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে, বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ সহ অনান্য জলবায়ু তাড়িত তহবিল পর্যবেক্ষণে টিআইবি'র চলমান কার্যক্রমের আওতায় সার্বিক তহবিল প্রদানে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প প্রণয়ন, নির্বাচন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিলে অগ্রগতি ও সুশাসন পর্যবেক্ষন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের জন্য সুপারিশ পেশ করা। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো-

- বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;
- বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ কর্তৃক সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে যেসব প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়নে সুশাসন পর্যবেক্ষণ;
- বিসিসিটিএফ কর্তৃক এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচনে এবং বাস্তবায়িত সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে সুশাসন পর্যবেক্ষণ;
- সুপারিশ/উত্তরণের উপায় নির্ধারণ।

৩. গবেষণার পরিধি

এ গবেষণায় জলবায়ু অর্থায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ৬টি তহবিল (বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড, ফার্স্ট স্টার্ট ফাইন্যান্সিং, পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়ান্স, গ্লোবাল এনভাইরনমেন্ট ফ্যাসিলিটি এবং লীস্ট ডিভেলোপড কান্ট্রিস ফান্ড) হতে অর্থায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি/বরাদ্দ এবং তহবিল ভিত্তিক সর্বমোট বরাদ্দের পরিমাণ এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অনুমোদন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচন এবং বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট নির্ধারকের ভিত্তিতে সুশাসন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ জলবায়ু তহবিল প্রাপ্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্প সম্পর্কে প্রযোজ্য হলেও বাংলাদেশের সার্বিক জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

জলবায়ু অর্থায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প নির্বাচন এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পে সুশাসন নিরূপণে গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে এ অনুসন্ধানমূলক গবেষণাটি করা হয়েছে। এ গবেষণার আওতায় জলবায়ু

তহবিলের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ হতে সরকারি এবং বেসরকারি/এনজিও প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়িত নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রকল্পে সুশাসন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গবেষণার সময়কাল হলো সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত।

৪.১ বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পে সুশাসন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

টিআইবি কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফসহ অন্যান্য তহবিল হতে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন পর্যবেক্ষণের আওতায় তহবিলের ভিন্নতা, আকার, অভিযোজনের অগ্রাধিকার ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিসিআরএফ হতে ১টি করে মোট ২টি প্রকল্প পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। বিসিসিটিএফ হতে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন, নির্বাচন এবং বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে মোট ৪০ টি এনজিও সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। নির্বাচিত তিনটি এনজিওর প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তহবিল ছাড়, প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যবেক্ষণে যে নির্ধারক/সূচকসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

সারণি ১: গবেষণায় বিবেচিত নির্ধারক সমূহ

জলবায়ু তহবিল অনুমোদন (প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচন) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন
o স্বচ্ছতা/তথ্যের উন্মুক্ততা
o রাজনৈতিক প্রভাব (প্রতিষ্ঠান এবং/বা প্রকল্প অনুমোদন, প্রকল্প বাস্তবায়ন)
o তহবিল অনুমোদনে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি
o প্রকল্প প্রস্তাবের মান এবং প্রকল্পের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব
o প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আন্ত:প্রতিষ্ঠান সমন্বয় এবং জনবল
o প্রকল্প প্রণয়ন, এলাকা/প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্থানীয়/ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ
o জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অভিজ্ঞতা ও কার্যকর অভিযোজন তহবিল অনুমোদন/প্রকল্প সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান/কর্মীদের জবাবদিহিতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব, অর্থের সঠিক ব্যবহারে ঝুঁকি, বাজেটের কার্যকারিতা
o তদারকি ও পর্যবেক্ষণে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং তৃতীয় পক্ষ নজরদারির কার্যকারিতা
o অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির ব্যবস্থা
এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচন
o প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি/বোর্ডের জবাবদিহিতা
o প্রকল্পের কাজ শুরুতে বিলম্ব এবং প্রত্যাশিত ফলাফল
o প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা/দক্ষতা, প্রাতিষ্ঠানিক কাজে জলবায়ু পরিবর্তনে অগ্রাধিকার
o প্রকল্প এলাকায় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো এবং জনবল
o প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারীদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা
o জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা
o আর্থিক সততার চর্চা

৪.২ তথ্যের প্রত্যক্ষ উৎস

ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন

বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ অর্থায়নে বাস্তবায়িত সরকারি প্রকল্প

বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ তহবিলে বাস্তবায়িত সরকারি প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, পটুয়াখালি, পিরোজপুর, খুলনা এবং সাতক্ষীরায় প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে উপরোক্ত নির্ধারকের আলোকে প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে সুশাসন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা

হয়েছে। সাক্ষাৎকার এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় স্টেকহোল্ডার ও জনগোষ্ঠীর মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিসিসিটিএফ তহবিল প্রাপ্ত এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প

একইভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্বাচিত এনজিও সরেজমিন পরিদর্শন এবং পিকেএসএফ কর্তৃক নির্বাচিত এনজিওগুলো সম্পর্কে উপরে বর্ণিত নির্দেশকসমূহের (সারণি ১) আলোকে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

খ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার এবং মতামত সংগ্রহ

বিসিসিটিএফ বা বিসিসিআরএফ তহবিলে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং তদারকির কাজে প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাত্রা নিরূপন, প্রকল্পের জলবায়ু অভিযোজন/প্রশমন উপযোগিতা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ অর্থায়নে বাস্তবায়িত সরকারি প্রকল্প: বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ হতে অনুমোদিত তহবিলে বাস্তবায়িত প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষকদল প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক কাজে জড়িত সরকারি প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ, এলজিইডি, বিশ্বব্যাংক, পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় জনগণ, ব্যবসায়ী সমিতি ও স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ঠিকাদার, পরামর্শক, সুশীল সমাজ ও প্রকল্প তদারকি কাজে নিয়োজিত তৃতীয় পক্ষের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার ও তাদের মতামত সংগ্রহ করেছে।

বিসিসিটিএফ তহবিল প্রাপ্ত এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প

নির্বাচিত এনজিও এবং তাদের বাস্তবায়িত প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মুখ্য তথ্যদাতা ছিলেন পিকেএসএফ-এর কর্মকতাবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নির্বাচিত এনজিও/প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী ও প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, এনজিও বিষয়ক বিভিন্ন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার সাংবাদিক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে প্রকল্পের উপযোগিতা, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কোনো মতামত গ্রহণ করেছে কি না তা জানার জন্য সংশ্লিষ্ট জনগণের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

ঘ) হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ

বিসিসিটিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে অপসারিত বর্জ্য পরিমাপ করার জন্য টিআইবি কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় (রায়েরবাজার সংলগ্ন হাইক্কার খাল এবং নারায়ণগঞ্জের চারারগোপ) বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ (জুন, ২০১৩) পরিচালনা করা হয়। জরিপের মাধ্যমে বর্জ্য অপসারনের প্রকৃত পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৪.৩ তথ্যের পরোক্ষ উৎস

বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ কর্তৃক তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা; তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে[১] সংগৃহীত সরকারি ও এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রস্তাবনা, তহবিল সংক্রান্ত ওয়েবসাইট, গবেষণা প্রতিবেদন এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানে আবেদন করে অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব, নথি এবং প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪.৪ তথ্যের সত্যতা যাচাই, মান নিয়ন্ত্রণ, সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ

এই গবেষণার আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পাদনা করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্থানীয় জনসাধারণ, ঠিকাদার, সাংবাদিক ও তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রকল্প প্রস্তাবের ও তথ্যের ভিত্তিতে সত্যতা যাচাই করা হয়। তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণে গবেষক সরাসরি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান (সরকারি এবং এনজিও/বেসরকারি) ও প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছে এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মুখ্য ব্যক্তি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করা হয়। অন্য দিকে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য জরিপ কাজে নিযুক্ত ২ জন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞের সাথে টিআইবির গবেষকবৃন্দ তদারকি করে।

৪.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

তহবিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যের অপর্যাপ্ততায় নির্বাচিত সব এনজিও প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা, প্রকৃত সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী এবং প্রকল্পগুলোর আওতায় কী ধরণের কাজ হচ্ছে সেসব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি।

[১] সরকারি এবং এনজিও/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকল্প সম্পর্কে পূণাঙ্গ ধারণা নেয়ার জন্য তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিআইডব্লিউটিএ, এলজিইডি এবং ৫৫টি এনজিওতে প্রকল্প প্রস্তাবের জন্য আবেদন করা হয়। উল্লেখ্য প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব বিশ্লেষণ, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যের যাচাই বাছাই করে গবেষণার ফলাফল নিরুপণ করা হয়েছে।

৫. বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল হতে অর্থায়নে অগ্রগতি

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিসিসিটিএফ গঠন করা হয়। একইসাথে উন্নয়ন সহযোগী দেশ এবং সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ২০১০ সালে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড গঠন করা হয়। বিসিসিআরএফ-এর তহবিল ব্যবস্থাপক হিসেবে বিশ্বব্যাংক কাজ করছে। বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৯-এর আওতায় ৬টি বিষয়-ভিত্তিক খাতে অনুমোদনকৃত বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়েছে। খাতগুলো হলো, ১) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য; ২) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; ৩) অবকাঠামো; ৪) গবেষণা ও অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার বা ব্যবস্থাপনা; ৫) প্রশমন এবং কার্বন সাশ্রয়ী উন্নয়ন; এবং ৬) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ।

উল্লেখ্য যে বিসিসিএসএপি-২০০৯ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৫ বছরে ৫ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ গড়ে ১ বিলিয়ন ডলার অর্থের প্রয়োজন। তবে, উন্নত (এ্যানেক্স ১) দেশসমূহ জুন ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশকে ৫৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবায়নের জন্য প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। জুন ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিসিসিটিএফ প্রতিশ্রুত ৩৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দের বিপরীতে মোট ১৯০.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১৩৯ টি সরকারি প্রকল্প এবং ৬৩ টি এনজিও প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে বিসিসিআরএফ থেকে প্রতিশ্রুত মোট ১৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে অনুমোদনের পরিমাণ মোট ১৪৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়ান্স (পিপিসিআর), গ্লোবাল এনভাইরনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ) এবং লীস্ট ডিভেলোপড কান্ট্রিস ফান্ড (এলডিসিএফ) প্রভৃতি তহবিল থেকে যথাক্রমে প্রতিশ্রুত ১০৯.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৯.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে যথাক্রমে ০.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৬.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে[২]।

চিত্র ১: বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের প্রবাহ

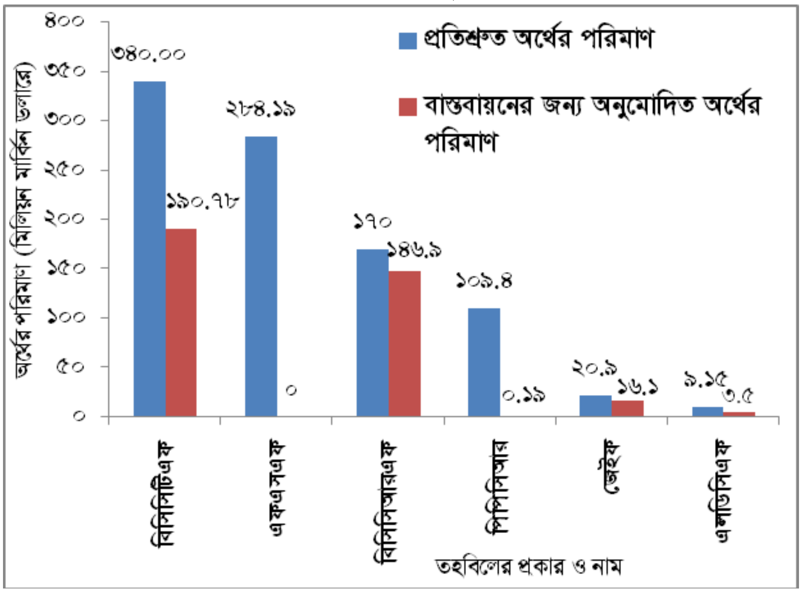

সূত্র: টিআইবি গবেষণা, জুন, ২০১৩

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন তহবিল (চিত্র-২) থেকে সার্বিকভাবে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী দেখা যায়, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থের

[২] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বিশ্ব ব্যাংক ওয়েবসাইট ও ক্লাইমেটফান্ডসআপডেট থেকে সংগৃহীত তথ্যর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত

(২১৮.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যা মোট তহবিলের প্রায় ৩২ শতাংশ। বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পগুলোর অধিকাংশই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও রাস্তা নির্মাণ সম্পর্কিত। এরপরই বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান, যা বিভিন্ন জলবায়ু তহবিল থেকে অনুমোদিত অর্থের ২৩.৩ শতাংশ (১৫৯.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) পেয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাংকের জিইফ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ পেয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সমন্বয়ের কাজে নিয়োজিত এবং এ মন্ত্রণালয় অনুমোদিত বিভিন্ন প্রকল্পে বিভিন্ন তহবিল থেকে মোট তহবিলের ১১.৫ শতাংশ বরাদ্দ পেয়েছে; তবে প্রতিষ্ঠানটি বিসিসিটিএফ এবং এলডিসিএফ থেকেই বেশি তহবিল পেয়েছে (চিত্র ২, ৩)।

চিত্র ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগ অনুযায়ী বাংলাদেশে সার্বিক অর্থায়ন

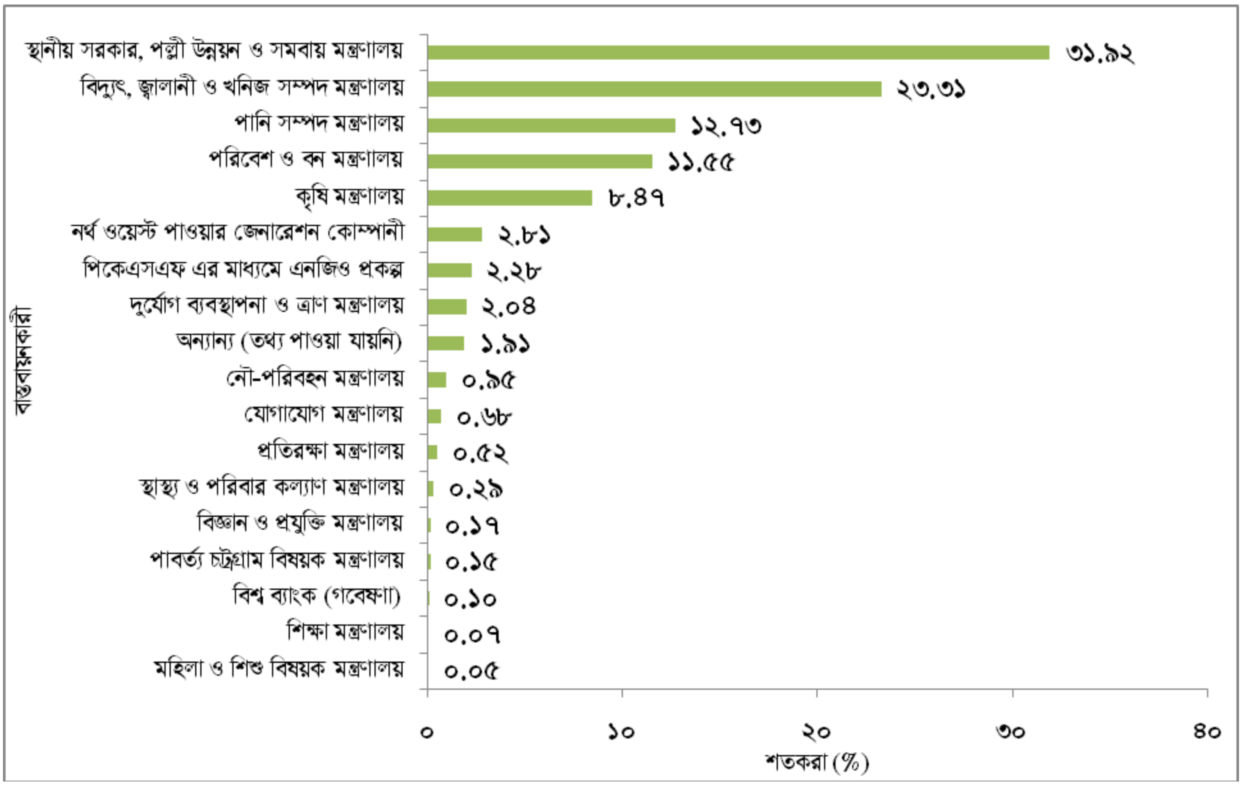

সূত্র: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বিশ্বব্যাংক এবং ক্লাইমেটফান্ডসআপডেট, জুন, ২০১৩

উল্লেখ্য, বিসিসিটিএফ হতে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ১৩৯ টি প্রকল্পে ১৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমানের তহবিল অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাঁধ নির্মাণ, নদী ও খাল খনন, নদীর তীর সংরক্ষণ এবং নদী ও খালের নাব্যতা রক্ষা বিষয়ক প্রকল্পে বিসিসিটিএফ হতে সর্বোচ্চ ৪৫.২ শতাংশ তহবিল অনুমোদন পেয়েছে। অন্যদিকে, বন অধিদপ্তর ১৪.৩৫ শতাংশ, ত্রাণ ও পূনর্বাসন অধিদপ্তর ১০.৬৮ শতাংশ, পরিবেশ অধিদপ্তর ৯.২৩ শতাংশ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ ৬.৩৭ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে। অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান বাকি ৩১.২৫ ভাগ অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে। তাছাড়া, এলডিসিএফ থেকে বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০ শতাংশই পেয়েছে পরিবশে ও বন মন্ত্রণালয়, জিইএফ হতে সর্বোচ্চ ৬১.১ শতাংশ অর্থ পেয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় এবং পিপিসিআর হতে সর্বোচ্চ ৯৭.৮ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয় (এলজিআরডি)।

চিত্র ৩: তহবিলের উৎসভেদে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তহবিল প্রাপ্তি

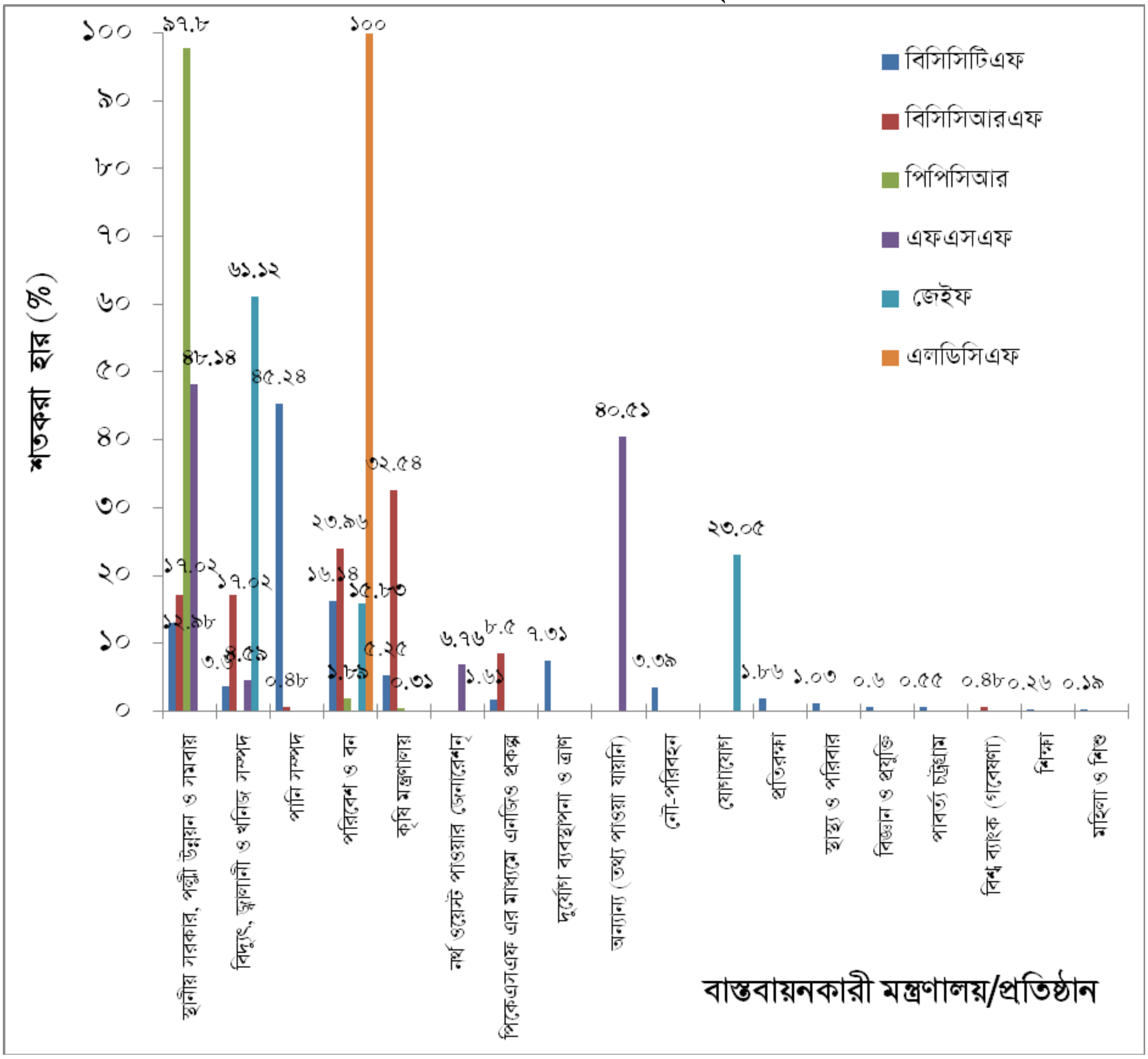

সূত্র: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বিশ্বব্যাংক এবং ক্লাইমেটফান্ডসআপডেট, জুন ২০১৩[৩]

[৩] বিভিন্ন উৎস হতে বিক্ষিপ্তভাবে রক্ষিত তথ্য সংগ্রহ করে সার্বিক তথ্য ভান্ডার (ডাটাবেজ) তৈরির মাধ্যমে সার্বিক অর্থায়নেঅগ্রগতি বিশ্লেষণ করা হয়

৬. বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ-এর সহায়তাপুষ্ট সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন পর্যবেক্ষণ

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন মানের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে। তাই, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু কার্যক্রম গ্রহণে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। টিআইবি'র চলমান জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন পর্যবেক্ষণের আওতায় বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ হতে প্রাপ্ত তহবিলে বাস্তবায়িত দুটি প্রকল্পের সুশাসন পর্যবেক্ষণ করা হয়; প্রকল্প সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য নিম্নরুপ (সারণি ২)।

সারণি ২: প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

তহবিলের উৎস	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	বাস্তবায়ন কাল
বিসিসিআরএফ	জরুরি ২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন (Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project-ECRRP)	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৯৪.৩৭৫	ডিসেম্বর,২০০৮-জুন,২০১৩
বিসিসিটিএফ	ঢাকার রায়ের বাজার সংলগ্ন হাইক্কার খাল ও নারায়ণগঞ্জের চারারগোপের সঞ্চিত পলিথিনসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কতৃপক্ষ	২২.১৮	জুলাই,২০১১-জুন,২০১৩

সূত্র: বিআইডব্লিউটিএ এবং এলজিইডি, ২০১২

৬.১ বিসিসিআরএফ অর্থায়নে বাস্তবায়িত "জরুরি ২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন" প্রকল্প

৬.১.১ প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন

বিশ্বব্যাংক ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে "Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)" প্রকল্প অনুমোদন করে। এর প্রকল্প ব্যয় ছিল ৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা আইডিএ (International Development Association) ঋণ হিসেবে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বিসিসিআরএফ'র গভার্নিং কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালের আগস্ট মাসে বিসিআরএফ থেকে এ প্রকল্পে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সরবরাহ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ৫৬টি নতুন বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও ৫টি সংযোগ সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পটি বর্তমানে উপকূলীয় বরগুনা, খুলনা, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর ও পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আশ্রয়কেন্দ্রের অবকাঠামোগত সুবিধা

প্রকল্পের আওতায় নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে ৫ ধরনের নির্মাণ নকশা/মডেল তৈরি হলেও নির্মাণ স্থানের ভৌগলিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, স্থানীয় চাহিদা বিবেচনা করে উপযুক্ত মডেলটি যে স্থানে প্রযোজ্য সে স্থানের জন্য নির্ধারণ করা হয়। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো সাধারণত স্কুল/মাদ্রাসা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও দুর্যোগের সময় মানুষের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা শৌচাগার, দুর্যোগের সময় নারীদের প্রসবকালীন সুবিধা ও শৌচাগারসহ একটি কক্ষ, সৌর শক্তি ও বিদ্যুৎ সুবিধা সহ বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

জমি/স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়া

উপজেলা শিক্ষা কমিটি স্কুলসহ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ স্থান যাচাই করে। এ কমিটিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংসদ সদস্য ছাড়াও আরো অনেকেই সদস্য থাকে যারা স্থান নির্ধারন করেন এবং সর্বশেষ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে অলোচনা সাপেক্ষে নির্মাণ স্থান চূড়ান্ত করা হয়। স্থান নির্বাচনে নিকটবর্তী সাইক্লোন শেল্টারের অবস্থান, ১৫০০ জনের ধারণক্ষমতা, বন্যা আক্রান্ত অঞ্চলে অবস্থান, স্কুল/মাদ্রাসা পরিচালনা এবং আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার উপযোগিতা ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয়। তবে কোথাও কোথাও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির জন্য স্থানীয় কোনো ব্যক্তি নিজস্ব জায়গা দান করেছেন। নকশা অনুসারে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর নির্মাণ ব্যয়ের তারতম্য রয়েছে, তবে প্রতিটির নির্মাণ ব্যয় ১.৭৫-২.৩০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক নির্মাণ কাজ শুরুর আগে জরিপের মাধ্যমে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা, জমির পরিমাণ নির্ধারণ ও সামাজিক জরিপ (এলাকার জনসংখ্যা, স্কুলের মোট ছাত্রের পরিমাণ) সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করলেও স্থান নির্বাচনে আশ্রয় গ্রহণকারীর সংখ্যার ওপর বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে প্রকল্প কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা জানান।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন

৩৫ কোটি টাকা পর্যন্ত দরপত্রের জন্য জেলা পর্যায়ে দরপত্র আহ্বান করা হয়, কিন্তু ৩৫ কোটি টাকার উপরে প্রকল্প ব্যয় হলে কেন্দ্রীয়ভাবে দরপত্র আহবান করা হয়। বিভিন্ন প্যাকেজের ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর দরপত্র আহ্বান করা হয়। যেমন- ২টি, ৪টি, ৮টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এমনকি ২৪টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নিয়ে একটি প্যাকেজ তৈরি করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। যখন কোনো ঠিকাদার দরপত্র জমা দেয় তখন তাকে সম্পূর্ণ প্যাকেজটির জন্যই দরপত্র জমা দিতে হয়। প্রতিটি প্যাকেজের দরপত্রের বিজ্ঞাপন দু'টি জাতীয় দৈনিক প্রত্রিকায় (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) প্রচার করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে ২৪টি আশ্রয়কেন্দ্র নিয়ে যে প্যাকেজ করা হয়েছিল তার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে দরপত্র আহবান (ICB-International Competitive Bidding) করা হয়েছিল।

৬.১.২ প্রকল্প বাস্তবায়িনে প্রকল্পে সুশাসন পর্যবেক্ষণ

ত্রুটিপূর্ণ তথ্য প্রকাশ এবং অস্বচ্ছতা

উন্নত দেশগুলো (সংযুক্তি-১) কর্তৃক ক্ষতিপূরণ বাবদ "নতুন" এবং "অতিরিক্ত" অর্থের ভিত্তিতে বিসিসিএরএফ প্রতিষ্ঠিত হলেও বিসিসিআরএফ-এর অর্থ নীতিগতভাবে কোনো অনুদান নয় বরং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলো কর্তৃক উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ। কিন্তু, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে দেখা যায়, বিসিসিআরএফ অনুমোদিত প্রকল্প সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ের তথ্যে তা ঋণ হিসাবে এবং তহবিলের উৎস হিসাবে বিশ্বব্যাংককে দেখানো হয়েছে (চিত্র ৪ দেখুন)। কোন যুক্তিতে একটি ঋণ নির্ভর প্রকল্পে বিসিসিআরএফ হতে অর্থ যোগান দেওয়া হলো তা সুস্পষ্ট নয়। এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, কোনো প্রকল্পের ডিপিপি (Detailed Project Proposal) তৈরি বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং যেহেতু বিসিসিআরএফ প্রদত্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্যও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, তাই বিশ্বব্যাংকের চলমান প্রকল্পে এ অর্থ সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কর্মকর্তারা আরো বলেন, বিশ্বব্যাংকের চলমান এ প্রকল্পে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নকশা বা নির্মাণ কাঠামো, নির্মাণ ব্যয়, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য অনেক বিষয় আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। তাই ২৫ মিলিয়ন ডলার অর্থ এ প্রকল্পে সম্পৃক্ত করায় কাজ সহজতর হয়েছে। প্রকাশিত তথ্যে অনুদানকে কেন বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত আইডিএ ঋণ হিসাবে দেখানো হলো তার কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে পাওয়া যায় নি। উল্লেখ্য, অর্থের প্রকৃত উৎস (ঋণ না অনুদান) সম্পর্কে

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দও অবহিত নন। বিশ্বব্যাংককে অর্থায়নের উৎস হিসেবে দেখানোর ফলে বিসিসিআরএফ'র প্রকল্প পর্যবেক্ষণ কাজ যথাযথভাবে আলাদা করে দেখা কঠিন। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক বিসিসিআরএফ-এ কোনো অর্থ যোগান দেয় না বরং কিন্তু নির্দিষ্ট চার্জের (৪-৫ শতাংশ) বিনিময়ে বরাদ্দকৃত তহবিলের ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে।

চিত্র ৪: বিসিসিআরএফ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বোর্ড

তথ্য সূত্রঃ সরেজমিন পরিদর্শন, ২০১২

অধিকাংশ এলাকায় বিশেষ করে দুর্গম ও যোগাযোগের অসুবিধা রয়েছে এমন এলাকায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ কোনো বিষয়ে স্থানীয় লোকদের সাথে যোগাযোগ করেন নি বলে জানা যায়। পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার হোগলবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়/সাইক্লোন শেল্টারের একজন শিক্ষক বলেন, স্থানীয় স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির (এসএমসি) কাছে প্রকল্পের কোনো শিডিউল দেয়া হয়নি ও স্থানীয় স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি প্রকল্প তদারকির সাথে সম্পৃক্ত নয় বললেই চলে। নির্মাণ কাজের সিডিউল স্থানীয় জনগণের কাছে উন্মুক্ত না করার ফলে কাজটির তদারকি সঠিকভাবে সম্পাদিত না হওয়ায় কাজের গুণগত মান নিশ্চিত হয়নি।।

প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সীমিত অংশগ্রহণ

জলবায়ু অভিযোজন/প্রশমন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের নির্দেশনা থাকলেও প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির পূর্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা করা হয়, কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় নির্মাণ স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্মাণ কাজ তদারকিতে স্কুল কমিটি ও স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পৃক্ত না করার অভিযোগ পাওয়া যায় (সূত্রঃ মূখ্য তথ্যদাতা)।

ঠিকাদার নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব ও ভীতি প্রদর্শন

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, প্রকল্পটি প্রণয়ন, ঠিকাদার নির্বাচন এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তির হস্তক্ষেপ ছিল। অভিযোগ পাওয়া যায় ঝালকাঠিতে ৩ টি প্যাকেজের ঠিকাদারি পেতে একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ভীতি প্রদর্শন করে (সূত্রঃ মূখ্য তথ্যদাতা)।

সরকারি ক্রয় আইন বিধি লংঘন ও উপ-ঠিকাদার (সাব-কন্ট্রাক্টর) নিয়োগ

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে জানা যায়, বেশ কিছু স্থানে মূল ঠিকাদার কর্তৃক ক্রয় আইন লঙ্ঘন করে সাব-কন্ট্রাক্টর (উপ-ঠিকাদার) নিয়োগের ঘটনা ঘটেছে। বাস্তবে একাধিক সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের কাজে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান নামে থাকলেও স্থানীয়ভাবে উপ-ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে কাজ করছে বলে জানা যায়; যেমন, পটুয়াখালীর বাউফলে চারটি সাইক্লোন শেল্টারের ১টি প্যাকেজের নির্মাণে নির্বাচিত হলেও এর মধ্য ২টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণে উপ-ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মত হলো, "এ ধরনের প্যাকেজ দরপত্রে স্থানীয় কম মূলধনের ঠিকাদারদের

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সুযোগ নেই, যারা অধিক মূলধনের যোগান দিতে সক্ষম এবং যথেষ্ট ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তারাই বরং টিকে থাকে”।

> **বক্স-১: স্থানভেদে প্রকল্প প্রাক্কলন যথার্থতা**
>
> প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা ‘এ’-তে তৃতীয় পক্ষ নজরদারির কাজে নিয়োজিত ফিল্ড রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার জানায়, দুর্গম এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় ঠিকাদাররা অনেক ক্ষেত্রে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে না এবং কোনো কোনো কাজের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দু’বার দেওয়ার ফলে কাজ শুরু করতে দেরি হয়। আবার কোনো কোনো ঠিকাদার বলেন, প্রদত্ত বাজেটের খাতভিত্তিক (যেমন, রড, সিমেন্ট) বরাদ্দের চেয়ে বাজারে দাম বেড়ে যাওয়ায় কাজ শেষে তাদের লাভ থাকবে না। উল্লেখ্য, অনুমোদনকৃত বাজেটের ৩০ শতাংশ বেশি টাকা খরচ করার সুযোগ থাকলেও অনেক ঠিকাদার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ৫% পর্যন্ত বাড়তি বাজেট ধরে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু স্থানীয় প্রকৌশলীদের মতে, বাস্তবে হয়তো ২০% বাড়তি টাকা ধরে বাজেট করলে কাজের মান ভালো হতো; দুর্গম এলাকা বিশেষ করে সাতক্ষীরা অঞ্চলে নির্মাণ কাজের জন্য আলাদা বাজেট দরকার ছিল যা বিশ্বব্যাংক বিবেচনা করেনি বলে অভিযোগ করেন জনৈক ফিল্ড রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (সূত্র: মাঠ পর্যবেক্ষণ, ২০১৩)

প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব

২০১১ সলে বিসিসিআরএফ থেকে ইসিআরআরপি প্রকল্পে অর্থ সরবরাহের কাজ শুরু হলেও প্রকল্প পরিদর্শনকালে দেখা যায়, কিছু নির্বাচিত জেলায় কাজ শুরু হয়নি; কিছু জেলায় পাইলিংয়ের কাজ থেকে শুরু হলেও অন্যান্য কাজ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। তবে, ইসিআরআরপি প্রকল্পটি ২০১৩ সালের জুনে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্প কর্মকর্তা ২০১৪ সালের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্তির প্রত্যাশা করছেন।

বাস্তবায়ন পর্যায়ে দুর্বল কাজের মান ও জবাবদিহিতা

প্রকল্প বাজেটে ঠিকাদারের লাভ হিসাব করে বাজেট প্রাক্কলন করা হলেও নিয়োগকৃত সাব-কন্ট্রাক্টর কর্তৃক প্রত্যাশিত লাভ নিশ্চিতে নিম্ন মানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের ফলে প্রকল্প কাজের মানের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বাস্তবায়নাধীন কয়েকটি সাইক্লোন শেল্টারের নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠী সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজের নিম্ন মান নিয়ে তারা নিম্নলিখিত অভিযোগ করেছে-

- নির্মাণ কাজে নিম্ন মানের পাথর, বালু ও রড ব্যবহার; সঠিক তদারকির অভাবে কিছু স্থানে পাইলিংয়ের রড ঢালাইয়ের সময় এক স্থানে স্তুপাকারে জমা হলেও তার উপরেই ঢালাইয়ের কাজ করা;
- নিম্ন মানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার এবং কংক্রিট ঢালাই ঠিকভাবে না করার ফলে শেল্টারগুলোর ভবিষ্যত স্থায়িত্ব হ্রাস; ফলে, ভবিষ্যতে বড় ধরনের দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা;
- ঢালাইয়ের নিচের স্তরে খারাপ মানের কাদা বালি ও মাটি মিশ্রিত ছোট নুড়ি ও নিম্নমানের পাথর; উপরের স্তরে তুলনামূলক ভাল পাথর দিয়ে কাস্টিংয়ে কোনো রকম পরিষ্কার ও বাছাই ছাড়াই খারাপ পাথর ব্যবহার করা। ঢালাইয়ে শুধু লাল সিলেটি বালি ব্যবহারের নিয়ম থাকলেও এর সাথে নিম্ন মানের সাদা বালি মিশিয়ে কাজ করা। উপজেলা অফিসে এ সংক্রান্ত অভিযোগ দিলে সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ রাখলেও পরবর্তীতে নিম্ন মানের ইট, পাথর ও রড দিয়েই কাজ করা হয়েছে;
- ঢালাইয়ের কাজে কোনো কোনো স্থানে লবণাক্ত পানি ব্যবহারের ফলে শেল্টারের আয়ু কমে যাওয়া;

- স্থানীয় শিক্ষকদের মতে, স্কুলের সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য যে ইট ব্যবহার করা হয়েছে তার মান পোড়া মাটির চেয়েও খারাপ। এ অভিযোগ সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, রাস্তার কাজের নির্মাণ সামগ্রীর মান খারাপ হওয়ার কারণে কাজ বন্ধ করা হয়েছে। নির্মাণ সামগ্রী পরীক্ষা করার পর আবার কাজ শুরু করার কথা জানান।

প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি

কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ বা মতামত উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করেছে। অন্যদিকে, ঠিকাদারদের বিভিন্ন অনিয়মের বিষয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানানোর ফলে একজন পাহারাদারকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে স্থানীয়ভাবে অভিযোগ পাওয়া যায়।

৬.১.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাত্রা ও তদারকির চ্যালেঞ্জ

স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক তদারকির কার্যকারিতা

সাইক্লোন শেল্টারগুলোর ভৌগলিক অবস্থানগত বিচ্ছিন্নতা, কোনো কোনো প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সঠিক তদারকির অভাবে কাজের মানের উপর সরাসরি প্রভাব পড়ছে। তাছাড়াও বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এলজিইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ দুর্গম এলাকায় পর্যাপ্ত তদারকি করেনি বলে জানায় স্থানীয় স্কুল কমিটির প্রতিনিধি।

নির্মাণ কাজ তদারকিতে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ ও কার্যকারিতা

স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয়ভাবে নির্মাণ কাজের তদারকির দায়িত্বে থাকলেও কয়েকটি জায়গায় কমিটির সম্পৃক্ততার অভাব ছিল। যেমন, প্রকল্প পরিদর্শনকালীন সময় পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর, ২০১২) পটুয়াখালির বাউফলে স্থানীয়দের নিয়ে কমিটি গঠন করার কথা থাকলেও কোনো কমিটি গঠন হয়নি। তবে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকর অংশগ্রহণ নির্মাণ কাজের সার্বিক গুণগত মান রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে প্রতিয়মান হয় (বক্স ২)।

> **বক্স ২: স্থানীয় স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকর তদারকি**
>
> রহমতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণে কাজের গুণগত মান রক্ষায় প্রকল্পের শুরুতেই স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্ব দেয়া হয়। নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত শিডিউল প্রধান শিক্ষক ও স্কুল কমিটির সভাপতির তত্ত্বাবধানে স্কুলেই উন্মুক্ত রাখা হয়। স্কুল কমিটির তদারকি ব্যবস্থা খুব জোরদার থাকায় ঠিকাদার কিছু কিছু কাজ গোপনে করতে চাইলেও স্কুল কমিটির জোরালো আপত্তিতে তা করতে পারেনি; যেমন প্রথমে ঠিকাদার মানসম্মত পাথর সররাহ না করলে পরে স্কুল কমিটির তৎপরতায় তা নিশ্চিত করতে বাধ্য হয়। তৃতীয় পক্ষ হিসাবে নিযুক্ত এফআরই ও এলজিইডি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী এ প্রকল্পে তৎপর বলে অভিমত ব্যবস্থাপনা কমিটির। স্কুল কমিটির সভাপতির ইলেকট্রিক কাজ সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকায় তিনি এ বিষয়টি ভালভাবে তদারকি করতে পেরেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এলজিইডির কর্মকর্তাবৃন্দ সবসময় প্রধান শিক্ষক ও স্কুল কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা করেছিলো। এর বিপরীত চিত্রও রয়েছে, পটুয়াখালী জেলার হোগলবুনিয়া সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের স্থানটি একটি প্রত্যন্ত গ্রাম হওয়ায় এবং যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ থাকার কারণে কোন কার্যকর তদারকি হয়নি এবং স্থানীয় স্কুল কমিটির কাছে ও জনগণের কাছে শেল্টার নির্মাণ সম্পর্কিত কোনো তথ্য বা প্রকল্প প্রস্তাব/শিডিউল প্রদান করা হয়নি (সাক্ষাৎকার, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১২)।

তৃতীয় পক্ষ নজরদারির কার্যকারিতা

বিসিসিআরএফ প্রকল্প কাজ তদারকিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের পক্ষ হতে তৃতীয় পক্ষ কনসালটেন্ট নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে যৌথভাবে Wilbur Smith Associates Ges Resource Planning and Management Consultant (pvt.) Ltd । কনসালটেন্সি ফার্ম

দু'টির পক্ষ থেকে স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত প্রকল্প কার্যক্রম তদারকির জন্য ফিল্ড রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (এফআরই) নিয়োগ করা হয়।

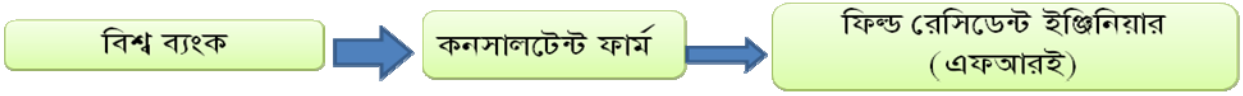

প্রকল্প বাস্তবায়নরত পাঁচটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এফআরইদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে তৃতীয় পক্ষ নজরদারির স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- এফআরইদের মতে, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে অবৈধ সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে, প্রকল্প কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য চাপ দিলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থের লোভ দেখায়, সেক্ষেত্রে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের কথা অনুসারে কাজ না করলে ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলি করাতে সক্ষম হয়। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের একাধিক কর্মকর্তা কর্মচারীর সাথে স্থানীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকদের এক ধরনের সখ্যতার মাধ্যমে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক তৈরি হয়। তৃতীয় পক্ষ হিসাবে এফআরইদের অবস্থানের ফলে দুর্নীতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় এফআরইকে ভয় দেখানো এবং সত্য রিপোর্ট করলে "গলা কেটে ভাসায়ে দেবো" এ জাতীয় মন্তব্যও শুনতে হয় (সরাসরি সাক্ষাৎকার, সেপ্টেম্বর, ২০১২)। এফআরই সবসময় এলজিইডি এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান উভয় পক্ষের চাপের মধ্যে থাকে। একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় ১ বছরের মধ্যে ১২ জন এফআরই চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। মাঠ পর্যায়ে এফআরই সার্বক্ষণিক থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে বিভিন্ন চাপের কারণে মাঠে থাকতে না পারায় তদারকি ব্যাহত হয়।
- এফআরই'র অফিস স্থানীয় এলজিইডি থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে না। নিয়ম না মেনে নির্মাণ সামগ্রীর মান যাচাই রিপোর্ট পাওয়ার অগেই সেই নির্মাণ সামগ্রী ও অর্থের ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করতে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী এফআরই'র ওপর চাপ প্রয়োগ করে যা তারা অগ্রাহ্য করতে পারে না।
- এফআরইরা স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদারদেরও চাপের মুখে থাকে। পরিদর্শন ছাড়াই বিলে স্বাক্ষর করার জন্য ঠিকাদারদের চাপের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ও ডেপুটি প্রকল্প পরিচালক জানান, এ বিষয়ে তাদের কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি, বরং এফআরইরা দুর্গম এলাকায় কাজ করতে চান না; ভাল চাকরির সুযোগ পেলে তারা চাকরি ছেড়ে চলে যান।

সার্বিকভাবে, জলবায়ুজনিত দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলেও রাজনৈতিক প্রভাব, কিছু ঠিকাদার ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের অনৈতিক কার্যক্রমে প্রবণতার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ঝুঁকির মাত্রা আরো বেড়ে যাবে বলে স্থানীয় ব্যক্তিরা জানান।

৬.২ বিসিসিটিএফ অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প পর্যবেক্ষণ (ঢাকার রায়ের বাজার সংলগ্ন হাইক্কার খাল ও নারায়ণগঞ্জের চারারগোপের সঞ্চিত পলিথিনসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ প্রকল্প)

"হাইক্কার খাল তুমি কার?" এ রকম একটি রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশের পর বিআইডব্লিউটিএ "ঢাকার রায়ের বাজার সংলগ্ন হাইক্কার খাল ও নারায়ণগঞ্জের চারারগোপের সঞ্চিত পলিথিনসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ" নামক প্রকল্পটি গ্রহণ করে। সময়ের আবর্তে বুড়িগঙ্গা নদী পলিথিন ও বিভিন্ন ধরণের বর্জ্য দিয়ে ভরাট হয়ে যাওয়ায় ঢাকার ধানমন্ডি, রায়েরবাজার এবং জিগাতলায় বর্ষা মওসুমে প্রায়ই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ও পয়ঃনিষ্কাশনে অসুবিধা হয়। এছাড়া শীতলক্ষ্যা নদীতে বিগত ১০০ বছর যাবত শিল্প কারখানার বর্জ্য (বিশেষ করে হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারী, ডাইং ফ্যাক্টরীসহ অন্যান্য শিল্প কারখানার বর্জ্য নিক্ষেপ), মানব বর্জ্য, সলিড ওয়েস্ট (পলিথিন, গার্বেজ, কাদা মাটি ও বালু) নদীতে চলে আসায় নারায়ণগঞ্জ, চারারগোপ বেসিনের তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এসব বিবেচনা করে ঢাকার রায়েরবাজার সংলগ্ন হাইক্কার খাল এবং নারায়ণগঞ্জের চারারগোপে স্তুপীকৃত পলিথিনসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণের মাধ্যমে নদী/খালে পানি প্রবাহ বৃদ্ধিসহ এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন এবং খালের তীরের ময়লা পরিষ্কারের জন্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়। জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মূলত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ প্রকল্প প্রস্তুত করে এবং ২৩শে মার্চ, ২০১১ সালে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্প এলাকা হলো ঢাকার রায়েরবাজার সংলগ্ন হাইক্কার খাল ও নারায়ণগঞ্জ বন্দর সীমানাস্থ চারারগোপ। প্রকল্প প্রস্তাবে হাইক্কার খালের ২.৭৩৫ কিমি ও চারারগোপের ২.২৬ কি.মি. পলিথিনসহ বর্জ্য অপসারণের পরিকল্পনা করা হয়। প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ২২.১৮ কোটি টাকা (নারায়ণগঞ্জ এলাকার জন্য প্রায় ১৪ কোটি ও হাইক্কার খাল এলাকায় প্রায় ৮ কোটি টাকা)।

ক) প্রকল্প প্রণয়ন এবং অনুমোদনে সুশাসন

দূষণের উৎসসমূহ বন্ধ না করে প্রকল্প অনুমোদন

হাইক্কার খাল সংলগ্ন স্লুইস গেট দিয়ে চামড়াজাত শিল্পের বিপুল পরিমাণ অশোধিত বর্জ্য প্রতিনিয়ত নদীতে পড়ছে। ফলে আবর্জনা উত্তোলনের পর নদীর যে নাব্যতা থাকা প্রয়োজন তা নিশ্চিত হচ্ছে না। উল্লেখ্য, ঢাকা ওয়াসা ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাথে কার্যকর কোনো সমন্বয় না করেই প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ঠিকাদারের দাবি, নদীর কোনো কোনো স্থান ১২ ফুট গভীর পর্যন্ত খনন করা হয়েছে, কিন্তু ১৫-১৬ মাস পর আবর্জনা আবারও পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসায় প্রকল্পটির স্থায়িত্ব নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে, প্রকল্প পরিচালকও একই আশংকা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আগে খাল শুকনা ছিল, খনন কাজ করার পর নাব্যতা বেড়েছে। স্লুইস গেইট দিয়ে নিয়মিত বর্জ্য প্রবাহিত হয়ে আসছে। হাজারীবাগ ট্যানারীর বর্জ্য স্লুইস গেটের মুখে ফেলা হয়"। এ অবস্থায় এ খাল দশ বছরও টিকে থাকতে পারবে না বলে মনে করে স্থানীয় অধিবাসী। রায়ের বাজার এলাকায় স্লুইস গেটের মুখে যাতে আবর্জনা ফেলা না হয় সে জন্য বিষয়টি ওয়াসার দৃষ্টিগোচর করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বাইরের মাটি এবং আবর্জনা যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে এলাকাবাসীকে যথেষ্ট সচেতন না করা গেলে বর্জ্য জমে আবার খাল ভরাট হয়ে যাবে এবং প্রকল্পের ফলাফল স্থায়ী হবে না।

প্রকল্প প্রণয়ন এবং অনুমোদনে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়

পলিথিনসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ প্রকল্প দু'টি পৃথক স্থানে বাস্তবায়নের কারণে প্রাথমিকভাবে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ততা থাকার কথা। এক্ষেত্রে কাজের ধরণ, নির্মাণ কাজের পরিমাণ ও বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণের মধ্যেও স্থানভেদে পার্থক্য রয়েছে (সারণি ৩)। অন্য দিকে, দুটি স্থানই স্থানীয় ব্যবসা কেন্দ্র এবং নদী বন্দর ও পণ্য পরিবহণের ঘাট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে, নদী পথে ব্যবসার স্থান হিসেবে স্থানীয় ইট, পাথর, বালু ও মাছ ব্যবসায়ীদের কাছে স্থানটির

ব্যবহারিক গুরুত্ব পর্যাপ্ত, বিশেষ করে ঘাট শ্রমিক মালিকরা প্রকল্পটির অন্যতম স্টেকহোল্ডার ও ব্যবহারকারী। দু'টি স্থানের মধ্য হাইক্কার খাল নামক স্থানটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, বিআইডব্লিউটিএ ও ঢাকা ওয়াসার কর্ম এলাকার অর্ন্তগত। অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জ অংশের কাজের সাথে বিআইডব্লিউটিএ ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ঘাট মালিক শ্রমিক সংগঠনগুলো সম্পৃক্ত। কিন্তু প্রকল্প প্রণয়নকালে বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং স্থানীয় ঘাট ব্যবসায়ী ও শ্রমিক মালিক সংগঠনগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের প্রয়োজন হলেও তা নিশ্চিত করতে পারে নি।

খ) প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন

প্রকল্পের যথার্থতা

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯-এ চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার আওতাভুক্ত না হওয়ায় এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বেশকিছু সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কাজের ক্ষেত্র হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ উল্লিখিত প্রকল্প এলাকায় বরাদ্দের বিষয়টি আরও অধিকতর বিবেচনার দাবি রাখে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার আক্রান্ত জনগোষ্ঠী নির্দিষ্ট অভিযোজন কার্যক্রমের অভাবে এখনো আইলা ও সিডরের আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারেনি[৪]। স্থানীয় কোনো কোনো নাগরিকের মতে, এ প্রকল্প হাতে নেয়ার মাধ্যমে হাইক্কার খাল এলাকায় দুটি হাউজিং কোম্পানীর নদীর তীর দখল বন্ধ করার জন্য নদীর সীমানা নির্ধারণ করা খুবই জরুরি ছিল। সীমানা নির্ধারনের অংশ হিসাবে নদীর দু'পাশে ৬ ফুট রাস্তা তৈরি এবং নদীর তলদেশ পরিস্কার করার ফলে নদীর নাব্যতা সাময়িকভাবে বাড়লেও বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের স্থায়ীত্বশীল পদক্ষেপের বিবেচনায় এ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং কাজের সার্বিক মান নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় প্রকল্পের সুফল স্থায়ী হবে না। একইসাথে, জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর ফলাফল নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না, বরং বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয় হবে।

সমন্বয়হীনতা ও প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্পটির সফলভাবে বাস্তবায়নে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তঃসমন্বয় করে কাজ করার কথা থাকলেও প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা ওয়াসার সাথে কোনো সমন্বয় সাধন করা হয় নি। অন্যদিকে, নারায়ণগঞ্জের চারারগোপ প্রকল্প এলাকা জুড়ে বেশ কিছু আড়তের অবস্থান থাকায় প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ময়লা আবর্জনার সৃষ্টি হয়। বিআইডব্লিউটিএ'র পক্ষ হতে আবর্জনা সংরক্ষণের জন্য সাময়িকভাবে ২০টি বিন ও ১টি গার্বেজ পয়েন্ট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতি এক সপ্তাহ পর সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি ময়লা সরিয়ে নিয়ে যায় বলে বিআইডব্লিউটিএ কর্মকর্তারা দাবি করলেও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি নিয়মিত এ কাজ করে না এবং ময়লা নিষ্কাশনে সিটি কর্পোরেশনে গাড়ির অপ্রতুলতা রয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রকল্পটি বাস্ববায়নে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও বাস্তবায়ন পরবর্তী অবস্থার স্থায়িত্ব নিয়ে বেশি সংশয় প্রকাশ করেছেন। তারা মনে করেন, প্রকল্পটির ফলাফল স্থায়ী করতে বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা ওয়াসা এবং সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন; তা না হলে নদী ও খাল খনন করার সুফল বেশি দিন স্থায়ী হবে না।

[8] http://www.thedailystar.net/beta2/news/50-squar-km-turned-into-wasteland/

রাজনৈতিক এবং ভূমি 'দস্যু'র প্রভাব

মুখ্য তথ্যদাতার মতে, প্রকল্পটির ঠিকাদার নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব ছিল; ক্ষমতাধর একজন রাজনীতিকের একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রকল্পের ঠিকাদারি পান। স্থানীয় অধিবাসীর মতে, প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় ভূমি দস্যুদের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। শুরুতে তারা কাজ শুরু করতে বাধা দিচ্ছিল। পুলিশের উপস্থিতিতে মাটি কাটা হয় এবং বিভিন্ন আইনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করতে হয়েছে। প্রকল্প কাজ তদারকিতে নিয়োজিতদের স্থানীয় ভূমি 'দস্যু' বলে পরিচিতরা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে।

স্থায়ী বর্জ্য নিষ্কাশন পয়েন্ট নির্মাণ না করা

বুড়িগঙ্গা নদীর রায়ের বাজার অংশে হাইক্কার খাল পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ থাকলেও নদীর তলদেশের উত্তোলিত বর্জ্য রাখার কোনো গার্বেজ পয়েন্ট নির্মাণ করা হয়নি। এ বিষয়ে ঠিকাদার বলেন, "প্রকল্প এলাকাটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন, গার্বেজ পয়েন্ট নির্মাণ করতে গেলে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি লাগে যা সময় সাপেক্ষ। দু' মাস অপেক্ষা করার পরেও অনুমতি পেতে বিলম্ব হওয়ায় তা তৈরি করা সম্ভব হয় নি"। প্রকল্পের আর্থিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, "সকল বাস্তবতা বিবেচনা এনে স্টিয়ারিং কমিটি হাইক্কার খাল অংশে গার্বেজ পয়েন্ট নির্মাণ না করার পরামর্শ প্রদান করেছিলো"।

অব্যয়িত অর্থ সম্বন্ধে অস্বচ্ছতা

প্রকল্প প্রস্তাবে ৪.১৬৬ লক্ষ ঘন মিটার ময়লা অপসারণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। বিআইডব্লিউটিএ'র আর্থিক প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে, বর্জ্য উত্তোলন এলাকার দৈর্ঘ্য ৫ কিমি এবং তা থেকে ৩.৬ লক্ষ ঘমি ময়লা অপসারণ করা হয়েছে এবং এজন্য ব্যয় হয়েছে ৬০৭.২ লক্ষ টাকা। টিআইবি কর্তৃক হাইড্রোগ্রাফিক জরিপে, প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখিত কর্ম এলাকার দৈর্ঘ্যের সাথে সম্পাদিত কর্ম এলাকার দৈর্ঘ্যের মধ্যে বাস্তবে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; কর্ম এলাকার জন্য বরাদ্দকৃত এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমাণেও পার্থক্য পরিলক্ষ্যিত হয় (সারণি ৩)।

সারণি ৩: বিআইডব্লিউটিএ'র প্রকল্প প্রস্তাব, আর্থিক প্রতিবেদন এবং টিআইবি জরিপের তুলনা

প্রকল্প প্রস্তাব/ প্রতিবেদন	বর্জ্য উত্তোলন এলাকার দৈর্ঘ্য (কিমি)	উত্তোলিত বর্জ্যের পরিমাণ (লক্ষ ঘমি)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অ-ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
প্রকল্প প্রস্তাব	----	৪.১৬৬	১০৯৯.৭৫	৫৪৫.৩৫ (প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে তুলনা করে)
বিআইডব্লিউটিএ আর্থিক প্রতিবেদন	৫	৩.৬	৬০৭.২	৫২.৮ (বিআইডব্লিউটিএ আর্থিক প্রতিবেদনের সাথে তুলনা করে)
বিআইডব্লিউটিএ জরিপ	২.৬৭	২.৩	৬০৭.২	
টিআইবি'র জরিপ	২.৬৭	২.১	৫৫৪.৪*	

*প্রকল্প প্রস্তাবে প্রতি ঘনমিটার ময়লা অপসারণ ব্যয় ২৬৩.৯৮ টাকা ধরা হয়েছে

সূত্র: টিআইবি ও বিআইডব্লিউটিএ'র হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ, বিআইডব্লিউটিএ'র আর্থিক প্রতিবেদন ও প্রকল্প প্রস্তাবের আলোকে বিশ্লেষণ, অক্টোবর,২০১৩

বিআইডব্লিউটিএ'র আর্থিক প্রতিবেদনে যদিও উল্লেখ করা হয়েছে, বর্জ্য উত্তোলন এলাকার দৈর্ঘ্য ৫ কি.মি., কিন্তু বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক পরিচালিত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তা ২.৬৭ কিমি। টিআইবি'র হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের সাথে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক পরিচালিত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের তথ্য উপাত্ত তুলনা করলে দেখা যায়, ময়লা অপসারণ বাবদ ৫২.৮ লক্ষ টাকা এবং টিআইবি'র হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের সাথে প্রকল্প প্রস্তাবের তথ্য-উপাত্ত তুলনা করলে দেখা যায় ৫৪৫.৩৫ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকার কথা।

সারণি ৪: বিআইডব্লিউটিএ'র অবস্থান এবং টিআইবি গবেষণার তুলনা

প্রকল্প খরচ সংক্রান্ত খাত	বরাদ্দের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বিআইডব্লিউটিএর অবস্থান	টিআইবি'র পর্যবেক্ষণ
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১৮	পুরো অর্থ ব্যয় হয়েছে	স্থানীয় জনগণ প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত নয়
জনসচেতনতামূলক কাজ	১৮	করা হয়েছে	মাত্র ৭টি সাইনবোর্ড দৃশ্যমান
উচ্ছেদ অভিযান	২০	সম্পন্ন হয়েছে	প্রকৃত খরচের পরিমাণ সম্পর্কে অস্পষ্টতা রয়েছে
গার্বেজ সংগ্রহ স্থান	২০	সম্পন্ন হয়েছে	২টির মধ্য ১টি সম্পন্ন হয়েছে
বৃক্ষরোপন	২.২	সম্পন্ন হয়েছে	স্থানীয় জনগণ নিজস্ব অর্থায়নে বৃক্ষ রোপন করেছে
হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ, প্রকৌশল জরিপ ও সয়েল টেস্ট, ওয়াকওয়ে, মাটির রাস্তা, বাউন্ডারী ওয়াল, প্রিন্টারসহ কম্পিউটার ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।			

সূত্র: প্রকল্প প্রস্তাব, সরেজমিন পরিদর্শন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার, জুন ২০১৩

অন্যদিকে, প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পদির্শন, প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং প্রায় সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে ঝুঁকিটি সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক তা হলো প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন না হওয়া। তাছাড়াও, প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে ২জন পরামর্শক ৩ মাসের জন্য নিয়োগ করার বিষয় উল্লেখ ছিল এবং বেতন বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছিলো, কিন্তু প্রকল্প প্রস্তাবে পরামর্শক নিয়োগের কারণ এবং তাদের কাজের ক্ষেত্র সম্পর্কে বিষদভাবে কিছু উল্লেখ নেই। তবে, মাঠ পরিদর্শন এবং মাঠ পর্যায়ে বিআইডব্লিউটিএ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, প্রকল্পে কোনো পরামর্শক নিয়োগ করা হয় নি। প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ থাকলেও পরে কী কারণে তাদের নিয়োগ করা হয় নি তার সঠিক কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি। ফলে পরামর্শক নিয়োগ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের একটি অংশ অব্যয়িত রয়েছে।

সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি না থাকা

যদিও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রভাব সামান্য। স্থানীয় জনসাধারনের পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো কিছু কর্মসূচি প্রকল্পটিতে অন্তর্ভূক্ত করা জরুরি ছিল, যা অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাবে অনুপস্থিত।

অকার্যকর তদারকি ও মূল্যায়ন

প্রকল্প প্রস্তাবে ১০ সদস্যের একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি ও ৫ সদস্যের একটি মনিটরিং কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ ছিল। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, উভয় কমিটির প্রধান দায়িত্ব ছিল বাস্তবায়নাধীন কাজে অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান। বিআইডব্লিউটিএ হতে সংগৃহীত আর্থিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ষ্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছে। তবে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও

বিআইডব্লিউটিএ'র কর্মকর্তারা মনে করেন, প্রকল্প সমাপ্তির পর নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা না থাকায় প্রকল্পটি যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হাতে নেয়া হয়েছে তার সুফল ভোগ করা যাবে না।

৭. এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ

সরকারের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠার পর পিকেএসএফ ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে ২৬০টির বেশি এনজিওর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দক্ষতার সাথে কাজ করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিসিসিটিএফ ট্রাস্টি বোর্ড পিকেএসএফকে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত শুধুমাত্র একটি নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে নিযুক্ত করে[৫]। এ দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত কোনো সমঝোতা স্মারক/চুক্তিপত্র প্রকাশ করা হয়নি, তবে অনুদান গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে পিকেএসএফ'র চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে *"Bangladesh Climate Change Trustee Board (BCCTB)-এর অনুরোধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট[৬] অর্পিত ক্ষমতাবলে "ফাউন্ডেশন" BCCTB হতে সরবরাহকৃত অর্থ হতে এ সংক্রান্ত নীতিমালার আওতায় অনুদান প্রদান করে"*। এ প্রকল্প চুক্তিপত্রের প্রথম পক্ষ হিসাবে পিকেএসএফ স্বাক্ষর করে। শর্ত মোতাবেক পিকেএসএফকে "ফাউন্ডেশন" হিসাবে নিধারণ করা হয় এবং প্রকল্প/অনুদান গ্রহীতার কাছে "ফাউন্ডেশন" আইনসঙ্গত প্রতিনিধি, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট উত্তরাধিকারী, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং তহবিলের ধারক"[৭]। সার্বিকভাবে ২০১১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ণনা করা হল-

ধাপ-১: বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট (বিসিসিটি), যা পূর্বে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট (সিসিইউ) হিসাবে পরিচিত ছিলো, ২০১১ সালে এনজিও প্রকল্পের জন্য প্রস্তাব আহবান করে এবং এনজিওগুলো ৫০০০ এর বেশি প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেয়। এর মধ্য থেকে বিসিসিটি কর্তৃক ৫৩টি এনজিও প্রকল্পকে তহবিল বরাদ্দের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে;

ধাপ-২: এনজিও নির্বাচনে দুর্নীতি ও অসততার অভিযোগ পত্রিকায় প্রকাশের পর ২০১১ সালের আগস্ট মাসে বিসিসিটি তহবিল ছাড় স্থগিত করে;

ধাপ-৩: বিসিসিটি ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে পুনরায় পিকেএসএফ-কে বাতিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাব সহ মোট ১৩১টি এনজিও প্রকল্প প্রস্তাব পুন-মূল্যায়নের দয়িত্ব প্রদান করে;

ধাপ-৪: ২০১৩ সালে পিকেএসএফ চূড়ান্তভাবে ৫৫টি এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তহবিল প্রদানের জন্য নির্বাচন করে এবং বিসিসিটিএফ ট্রাস্টি বোর্ড পরবর্তীতে আরো ৮টি এনজিওসহ সর্বমোট ৬৩টি এনজিওর অনুকূলে অর্থ ছাড়করার দায়িত্ব পিকেএসএফকে প্রদান করে। উল্লেখ্য, এ ৮টি প্রতিষ্ঠান কিসের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয় সে সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয় নি।

[৫] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1062

[৬] পত্র স্মারক নং পবম/ঈঈট/ট্রাস্টি বোর্ডের সভা/৫৬/২০১২/(অংশ-৩)/৬৩৮, তারিখঃ ১৩/০৮/২০১২ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক

[৭] জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল হতে প্রদত্ত এনজিও প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তিপত্র

বিসিসিটিএফ থেকে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচন এবং তহবিল বরাদ্দ

কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোজন প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু এনজিও/কমিউনিটি প্রতিষ্ঠান সমূহের তৃণমূল পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা বেশি তাই বিসিসিটিএফ/বিসিসিআরএফ হতে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অভিযোজন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিধান রাখা হয়। এ গবেষণায় দেখা যায়, বসিসিটিএফ হতে এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়নরত ৫৫টি প্রকল্পে মোট প্রায় ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ২৬ শতাংশ অর্থ অভিযোজন বাবদ (অবকাঠামো এবং সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য) অনুমোদন করা হয়।

এর মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে মোট ৪.৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় যা এনজিও খাতে মোট বরাদ্দের ২৪.১৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, ৫৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান গড়ে ২০-৩০ লক্ষ টাকার প্রকল্প অনুমোদন পেলেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে ২টি এনজিও মোট ৩.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে মোট ২২টি প্রকল্পে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছে যা এ খাতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৮.৪৮ শতাংশ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে জলবায়ু অভিযোজন অগ্রাধিকার হলেও প্রশমন ও কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য বনায়ন বাবদ মোট বরাদ্দের ২১.১৭ শতাংশ অর্থ অনুমোদন করা হয়। অন্যদিকে, গবেষণা খাতে ১২.৭০ শতাংশ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২.২৪ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যা মোট বরাদ্দকৃত অর্থের তুলনায় অপ্রতুল। খাদ্য নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ ৩৮.৪৮ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হলেও তার প্রকৃত উপকারভোগী কারা এবং কীভাবে তাদের নির্বাচন করা হবে তা নিশ্চিত নয়।

চিত্র ৫: এনজিও তহবিল বরাদ্দের অগ্রাধিকার খাত/থিম

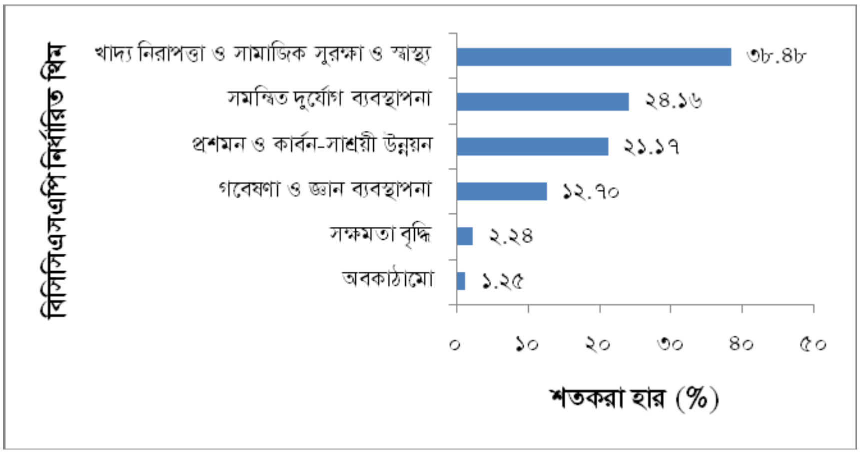

এ খাতে বরাদ্দ বেশি প্রদানের কারণ হিসেবে রাজনৈতিক প্রভাব এবং ক্ষমতার অপব্যবহারকে প্রধান চ্যালেঞ্জ (মুখ্য তথ্যদাতা, ২০১৩)। উল্লেখ্য, তুলনামূলক বেশি অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১টি প্রতিষ্ঠানের একজন সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বর্তমানে বিসিসিটিএফ প্রকল্প নির্বাচন ও চূড়ান্ত অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।

৭.১ প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্প অনুমোদনে সুশাসন পর্যবেক্ষণ

তথ্যের উন্মুক্ততা এবং স্বচ্ছতা

এনজিও/বেসরকারি খাতে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পিকেএসএফকে দেয়া হলেও বিসিসিটি কর্তৃক পুরানো

> **বক্স ৩: বেসরকারি/এনজিও প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অস্বচ্ছতা**
>
> টিআইবি কর্তৃক একইসাথে পিকেএসএফ এবং প্রকল্প বরাদ্দ প্রাপ্ত ৫৫টি এনজিও'র কাছে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রকল্প প্রস্তাবের জন্য আবেদন করলে পিকেএসএফ বিসিসিটি'র পক্ষ হতে অনুমতি প্রদান করা হয় নি মর্মে তথ্য দিতে অপরাগতা প্রকাশ করে। এখন পর্যন্ত আবেদন নিস্পত্তি হয় নি। অন্যদিকে, মাত্র ২১টি (৩৮%) এনজিও তাদের প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করে এবং বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো তথ্য প্রেরণ করেনি (টিআইবি, ২০১৩)।

নির্বাচিত ৫৩টি প্রকল্পসহ প্রায় ৫,০০০ প্রকল্প থেকে প্রাথমিক বাছাই করে মোট ১৩১টি প্রকল্প নির্বাচন করে এবং তা যাচাই বাছাই এর দায়িত্ব পিকেএসএফকে প্রদান করে। পত্রিকাতে নির্বাচিত এনজিওগুলো সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত তথ্য আসলেও এ সংক্রান্ত কোনো প্রতিবেদন/তালিকা বিসিসিটিএফ বা পিকেএসএফ এখন পর্যন্ত প্রকাশ করেনি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার করে পিকেএসএফ হতে ৫৫টি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান এবং তাদের প্রকল্প প্রস্তাবের একটি তালিকা সংগ্রহ করেছে যেখানে প্রতিটি নির্বাচিত এনজিও'র বিপরীতে নির্বাচিত প্রকল্পের নাম, ঠিকানা, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও খাত (থিমভিত্তিক) সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। পরবর্তীতে টিআইবি'র পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নির্বাচিত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ চেয়ে বিসিসিটি'র নিকট আবেদন করলেও তারা প্রকল্প প্রস্তাব প্রদানে অপারগতা জানিয়ে পিকেএসএফ এর নিকট আবেদন করতে পরামর্শ দেয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে পিকেএসএফ'র নিকট আবেদন করা হলে বিসিসিটিএফ'র পক্ষ হতে অনুমতি প্রদান না করার অজুহাতে পিকেএসএফ প্রকল্প সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এনজিও/থিংক ট্যাংক/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প নির্বাচন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে তথ্যের উন্মুক্ততা বা স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ হলো:

- বিসিসিটিএফ পিকেএসএফকে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তহবিল প্রদান, প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল কাজে নিযুক্ত করলেও এ সংক্রান্ত শুধুমাত্র একটি নোটিশ ব্যতীত[৮] পিকেএসএফ ও বিসিসিটিরি'র মধ্যকার এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত সমঝোতা স্মারক/সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা (যেমন, নির্বাচন প্রক্রিয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা, দায়িত্বের পরিধি বা এখতিয়ার, সততা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন, সততার চর্চা, জবাবদিহিতা, আর্থিক এবং অন্যান্য দায়বদ্ধতা) প্রকাশ না করা/না থাকা;
- তথ্য (ধরণ এবং আকার) প্রকাশে বিসিসিটিবি, পিকেএসএফ এবং এনজিও'র এখতিয়ার সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করায় তথ্য সংগ্রহে দীর্ঘসূত্রিতা;
- বিসিসিটিবি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব এবং এনজিওগুলো মূল্যায়ন করে ১৩১টি এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প নির্বাচন সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ না করা;
- জুন ২০১৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ কর্তৃক এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদিত ৬৩ টি প্রকল্প নির্বাচন বা এ সংক্রান্ত তালিকা ওয়েবসাইটে এখন পর্যন্ত পিকেএসএফ বা বিসিসিটিএফ কর্তৃক প্রকাশ না করা। পিকেএসএফ'র সাথে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, "বিসিসিটিবি এর সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো জরিপ বা সমীক্ষার ফলাফল বিসিসিটিএফ এর অনুদান গ্রহণকারী সংস্থা প্রকাশ করতে পারবে না"[৯], যা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে জলবায়ু প্রকল্প সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য প্রদানে পরোক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করছে (মুখ্য উত্তরদাতা, ২০১৩)। কিছু এনজিও মন্ত্রণালয় এবং পিকেএসএফ এর সম্মতি ছাড়া প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে রাজি হয় নি।

[৮] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1062
[৯] বিসিসিটিএফ প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তিপত্র-ধারা নং ১.১৯

পিকেএসএফ'র জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা

পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্র ঋণ সহ অন্যান্য কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা থাকলেও প্রতিষ্ঠানটি জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং এ সংক্রান্ত প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়নে তদারকি ও মূল্যায়নের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়াও, মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও তদারকির কাজে পিকেএসএফ নিয়োজিত কর্মীদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকল্প মূল্যায়ন সম্পর্কে পূর্ব প্রশিক্ষণ ছাড়াই দায়িত্ব প্রদানের ফলে সার্বিকভাবে প্রকৃত জলবায়ু অভিযোজনের অগ্রগতি মূল্যায়নে চ্যালেঞ্জ রয়েছে (মুখ্য তথ্যদাতা, ২০১৩)। কারণ, গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকাংশই অনভিজ্ঞ এবং তাদের অবকাঠামোগত অবস্থা দুর্বল ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের তথ্যের উন্মুক্ততা বা স্বচ্ছতা

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে তথ্য প্রকাশে বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য উন্মুক্ত করার জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকা একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত জরুরি। বিসিসিটিএফ হতে বরাদ্দ প্রাপ্ত মোট ৫৫টি এনজিওর মধ্যে **১৯**টি এনজিও'র নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকলেও সে ওয়েবসাইটে বিসিসিটিএফ প্রকল্প সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি। আবার যে সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট নেই তাদের তথ্য সরবরাহ ও সাধারণ জনগণকে তথ্য জানানোর একমাত্র মাধ্যম হল বার্ষিক প্রতিবেদন, যা তারা নিয়মিত প্রকাশ করে না। এমনকি একটি এনজিও তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন টিআইবি'র গবেষককে প্রদান করলেও পরবর্তীতে প্রতিবেদনটি সবার জন্য উন্মুক্ত নয় বলে তা ফেরত নিয়ে যায়। সার্বিক বিবেচনায় এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পগুলো কোথায় এবং কীভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে, কোন জনগোষ্ঠী কী ধরনের সুবিধা কীভাবে পাচ্ছে তা এখনো অজানা। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের আওতায় অনুমোদিত এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য জনগণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জানার আগ্রহ থাকলেও এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং অর্থায়নে অগ্রাধিকার

বিসিসিটিএফ নিযুক্ত পিকেএসএফ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত মোট ৫৫টি এনজিও প্রকল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ **১৯**টি বৃক্ষরোপণ, **১২**টি পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, **১২**টি সামাজিক সচেতনতা, ৫টি গবেষণা, ৩টি জীবন জীবিকা ও আয় বৃদ্ধি (কৃষি, মৎস), ২টি প্রযুক্তি হস্তান্তর, **১**টি কৃষি, **১**টি সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রকল্প অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বিসিসিটিএফ থেকে এনজিও/থিংক ট্যাংক/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা, প্রতিষ্ঠান বাছাই এবং প্রাথমিক অনুমোদনের দায়িত্ব পিকেএসএফ পালন করলেও চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে বিসিসিসিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ড (বিসিসিটিবি)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিসিসিএসএপি'র ঝুঁকি ম্যাপ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী, বরিশাল, চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চল। এ অঞ্চলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা এক মিটার বাড়লে অধিকাংশ এলাকা লবণাক্ত পানির নিচে তলিয়ে যাবে, ফলে খাদ্য শষ্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমবে এবং খাবার পানির সঙ্কট বাড়বে। কিন্তু বিসিসিটিএফ হতে খুলনা অঞ্চলে মাত্র ৬.৫% এবং সাতক্ষীরা অঞ্চলে **১**.২% স্বল্প পরিমাণ অর্থ ও প্রকল্প প্রদান; এমনকি আইলা আক্রান্ত বাগেরহাট এলাকায় কোনো তহবিল বরাদ্দ করা হয়নি। নির্বাচিত এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমোদিত প্রকল্প বাবদ অর্থের ২৪.০৩ শতাংশ চট্টগ্রাম বিভাগে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কক্সবাজারে কত শতাংশ বরাদ্দ হয়েছে তা সুস্পষ্ট নয়।

তবে বিসিসিএসএপির ঝুঁকি ম্যাপে যেসব এলাকা জলবায়ু পরিবর্তনে কম অভিঘাতগ্রস্থ হিসাবে চিহ্নিত এমন এলাকা যেমন, ঢাকা, টাঙ্গাইল সদর, গাইবান্ধা সদর, রাজশাহী ও নবাবগঞ্জে প্রকল্প বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং প্রকল্পগুলো অধিকাংশই বনায়ন সম্পৃক্ত। জলবায়ু পরিবর্তনে খরা ও বন্যায় অক্রান্ত হলেও কম ঝুঁকিপূর্ণ শহরাঞ্চল অর্থাৎ টাঙ্গাইল সদরে ৪টি, গাইবান্ধা সদরে ২টি, রাজশাহী ও নবাবগঞ্জ সদরে ১টি, ঢাকা নগরে ১টি প্রকল্প বরাদ্দ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, বিসিসিএসএপি'র অগ্রাধিকার থিম,অর্থায়নের খাত ও অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

নির্বাচিত ৫৫টি প্রকল্পের মধ্যে গবেষণা[১০] খাতে মোট ৫টি এনজিওকে প্রকল্প বাবদ দেয়া হয়েছে মোট বরাদ্দের ১২.৭%, যার মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ পেয়েছে। অন্যদিকে, যে এনজিওগুলোর প্রধান কাজের ক্ষেত্র "গবেষণা" বলে দাবি করেছে তারা গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন পায়নি বা আবেদন করেনি; বরং বনায়ন, পয়ঃনিস্কাশন বা অন্য খাতে তহবিল বরাদ্দ পেয়েছে (সূত্র: প্রকল্প প্রস্তাব অনুসারে বাস্তবায়ন এলাকা পরিদর্শন, পিকেএসএফ প্রদত্ত তালিকা, সরেজমিন পরিদর্শন, মুখ্য তথ্য দাতা, ২০১৩)। তাছাড়াও, বাংলাদেশে গবেষণা ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানগুলো সুনামের সাথে কাজ করছে সে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের ক্ষেত্র/থিম উদাহরণ হিসেবে বিসিসিএসএপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যারা এনজিও খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু পিকেএসএফ কর্তৃক নির্বাচিত এনজিও'র তালিকা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাস্তবে যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে তার সাথে বিসিসিএসএপিতে উল্লিখিত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠন ও তাদের কাজের ধরণের মধ্য কোনো মিল নেই এবং সংশ্লিষ্ট কাজে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান অনভিজ্ঞ (সারণি ৬)। উল্লেখ্য যে, বাস্তবায়নরত গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল কীভাবে এবং কোন ধরনের অভিযোজন কার্যক্রমে লাগবে তা বাস্তবায়নকারি এনজিওগুলো নিশ্চিত নয় এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কোনো কর্ম পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের কোনো পরিকল্পনা বিসিসিটিবি'র আছে কি না তা নিশ্চিত নয়। যেহেতু বিসিসিটিএফ হতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদানের অগ্রাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা নেই তাই সার্বিক বিষয় বিবেচনায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনগণ প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া অপরিহার্য। তবে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করলেও অধিকাংশ প্রকল্প প্রস্তাব না পাওয়ায় এবং পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে সবগুলো প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে) সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি।

প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্প নির্বাচনে রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাব

বিসিসিটিএফ কর্তৃক এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালার ১(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে, এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অরাজনৈতিক হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কিছু এনজিও'র পরিচালনা পরিষদ সদস্য এবং নির্বাহীরা স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তারে রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করেন। সরেজমিন পরিদর্শনে জানা যায়, মোট ৪০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩টি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও নির্বাহীরা রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত।

---

[১০] টিআইবি কর্তৃক সংগৃহীত প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাস্তবায়নরত গবেষণা প্রকল্পগুলোর মূল কার্যক্রমগুলো হলো, পরিবেশ ও প্রতিবেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, জলবায়ু অভিঘাত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে টিকে থাকার কৌশল নির্ধারণ, অভিযোজন পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে টিকে থাকার নির্দেশিকা তৈরি, পানি নিয়ে গবেষণা, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মাটি ও পানি নমুনা পরীক্ষা করা ও তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ, সিডর ও আইলার পর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মাটি ও পানির ওপর এর প্রভাব নির্ধারণ, সুবিধা প্রদানের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তির রক্ত, মূত্র পরীক্ষা করা, আইলা ও সিডরের পর বিভিন্ন রোগের ধরণ নির্ধারণ।

সারণি ৫: বিসিসিটিএফ থেকে নির্বাচিত এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনিয়ম

বিভিন্ন অনিয়ম	এনজিওর সংখ্যা
পিকেএসএফ প্রদত্ত তালিকা অনুসারে নির্বাচিত এনজিও'র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি	১০
বসবাসরত বাসা লিয়াজো অফিস হিসেবে ব্যবহার	৩
রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে প্রকল্প প্রাপ্তি	৯
প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী/পরিচালনা পর্ষদ সদস্য রাজনীতির সাথে জড়িত	১৩
নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য প্রকল্প বাবদ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ[১১]	২
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি নিবন্ধন বাতিল করেছিল	১
আইনী বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও প্রকল্প এলাকায় অফিস না থাকা	৪

সূত্র: মুখ্য উত্তর দাতা, মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান, জুলাই ২০১৩[১২]

মুখ্য তথ্যদাতার সাথে আলোচনায় জানা যায়, ৯টি প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বিশেষ করে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, এমপি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রভাব এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান যেমন, প্রকল্প প্রাক্কলনের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (২০%) কমিশন হিসাবে প্রদান, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ব্যক্তির পরিবার সংশ্লিষ্ট কোনো এনজিওকে অবৈধভাবে বাস্তবায়ন সহযোগী হিসাবে নিযুক্ত করা; অনৈতিক সুবিধা প্রদানের অভিযোগ যেমন, নীতি নির্ধারকের নির্বাচনী এলাকায় কম্পিউটার সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকল্প প্রাপ্তির অভিযোগ পাওয়া যায়। একজন এনজিও প্রধানের মতে, "অনেকের মতো তারাও প্রকল্পটি পাওয়ার জন্য স্থানীয় এমপির সাথে যোগাযোগ করলে সরকারের উপর মহলে তদবির করতে বলেন।" রাজনৈতিক এবং অনৈতিক প্রভাবের বিষয়টি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকজন ব্যক্তি স্বীকার করেছেন (মুখ্য তথ্যদাতা, ২০১৩)।

নির্বাচিত এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অফিস

গত ৭ অক্টোবর ২০১২ তারিখে পিকেএসএফ প্রদত্ত[১৩] নির্বাচিত ৫৫টি এনজিও'র তালিকা অনুযায়ী টিআইবি কর্তৃক ১৪ অক্টোবর ২০১২ হতে ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানে ১০টি এনজিও প্রতিষ্ঠানের অবস্থান খুঁজে পাওয়া যায় নি (সারণি ৫)। অস্তিত্বহীন এনজিওগুলোর মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত ঠিকানা অনুসারে গিয়ে দেখা গেছে যে, ঠিকানায় উল্লেখিত এলাকা সম্পূর্ণ আবাসিক বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ফ্লাট/বাসায় বসবাসকারী সদস্য ক্ষেত্রবিশেষে নিজেকে সংশ্লিষ্ট এনজিও'র কর্মকর্তা বলে স্বীকার করলেও প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সম্পর্কে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান; এর মধ্যে ২টি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলে একজন জানান প্রধান নির্বাহী বাসার বাইরে আছেন এবং অন্য একজন অফিস পরিবর্তন করার কথা জানান, কিন্তু পরিবর্তিত অফিসের ঠিকানা প্রদানে ব্যর্থ হন। বাকি ৬টির মধ্যে ২টি এনজিও প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড পাওয়া গেলেও বর্তমানে সে ঠিকানায় বাস্তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলছে, ফলে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মীর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। বাকি ৪টি এনজিও'র মধ্যে ৩টির ঠিকানায় সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং বাঁকি একটির ঠিকানা অসম্পূর্ণ। তাছাড়াও পিকেএসএফ প্রদত্ত তালিকা অনুসারে পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় ৫৫টি এনজিওর মধ্য ৪টি এনজিও তাদের ঠিকানা পরিবর্তন করেছে ।

[১১] এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা এর ১(ক)অনুচ্ছেদ, "এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে স্বেচ্ছাসেবী, সেবামূলক, অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক হতে হবে"

[১২] বিভিন্ন সময়ে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত তথ্যের সাথে যাচাই বাছাই করা হয়েছে

[১৩] স্মারক নং-পফ/পিকেএসএফ/ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট/০২/২০১২-৫৬১৬

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালার ৫ নং অনুচ্ছেদের (ক) ধারা অনুসারে আবেদনকারী এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যে এলাকার জন্য আবেদন করবে সে এলাকায় নিজস্ব অফিস ও উপযুক্ত জনবল থাকতে হবে বলা হলেও ৪টি এনজিওর প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় কোনো অফিস নেই। প্রকল্প এলাকায় অফিস না থাকার পরও কীভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এমন প্রশ্নের উত্তরে জানা যায়, ঐসব প্রকল্প এলাকায় নীতিমালা বহির্ভূতভাবে সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম চালানো হচ্ছে, ভবিষ্যতে প্রকল্প এলাকায় নতুন অফিস স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, প্রকল্প এলাকায় লোকবল ও অফিস না থাকার কারণে সে এলাকাগুলোতে নির্বাচিত এনজিওরা প্রকল্পের কাজ এখনো শুরু করতে পারে নি যদিও প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছে।

নির্বাচিত এনজিও'র জলবায়ু পরিবর্তন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা

বিসিসিটিএফ থেকে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালার ৩(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আবেদনকারী এনজিও বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীবন-জীবিকা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং উপযুক্ত প্রশাসনিক জনবল থাকতে হবে। অন্যথায় কোনো এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ বরাদ্দের জন্য বিবেচনা করা হবে না"। এর আওতায় সব ধরনের এনজিওদের কাজ করার সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, বিসিসিটিএফ থেকে প্রকল্প প্রাপ্ত ৫৫টি এনজিও'র[১৪] মধ্যে ১৭টি এনজিও পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাজ করলেও মাত্র ৪টি এনজিও'র প্রধান কাজের ক্ষেত্র জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও পাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (সারণি ৬)।

সারণি ৬ : নির্বাচিত এনজিও'র কর্ম অগ্রাধিকার

নির্বাচিত এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের ক্ষেত্র	প্রধান কাজের ক্ষেত্র	২য় প্রধান কাজের ক্ষেত্র	৩য় প্রধান কাজের ক্ষেত্র
ক্ষুদ্র ঋণ	১৭	৫	২
সমাজ কল্যাণ, দারিদ্র বিমোচন, হস্তশিল্প, সামাজিক সুরক্ষা, প্রতিবন্ধী, সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৩	১২	৬
গবেষণা	৩	১	১
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, পানি, স্যানিটারি ল্যাট্রিন, বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ, খেলাধুলা	১১	২০	১১
সচেতনতা, অ্যাডভোকেসি	১	১	২
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন	৪	৭	৬
সুশাসন, মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন	৪	৫	৩
বনায়ন, কৃষি	২	৩	২

সূত্র: প্রকল্প প্রস্তাব, মুখ্য উত্তরদাতা, সরেজমিন পরিদর্শন, এনজিও ব্যুরো ও সমাজ সেবা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ২০১২ সালের এনজিও তথ্য বিশ্লেষণ, জুন ২০১৩

নির্বাচিত এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

বিসিসিটিএফ হতে নির্বাচিত অধিকাংশ এনজিও'র দু' থেকে তিনটি বা তার বেশি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন রয়েছে। এনজিও প্রদত্ত ও এনজিও ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ৫৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্য ৩৪টি সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং ২১টি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর আওতায় নিবন্ধিত। অন্যদিকে ১১টি এনজিও সমাজ সেবা আধিদপ্তর ছাড়াও এক বা একাধিক সরকারি

[১৪] ৫৫টি এনজিওর মধ্য ৪০টি এনজিও সম্পর্কে তথ্য সরেজমিন পরিদর্শন করে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে এনজিওগুলোর নিজস্ব ওয়েবসাইট, এনজিও ব্যুরো ও সমাজ সেবা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত জেলা ভিত্তিক এনজিও তালিকার (২০১২) সাথে যাচাই বাছাই করা হয়েছে। বাকি ১৫টি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সমাজ সেবা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত জেলা ভিত্তিক এনজিও তালিকা (২০১২) সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা অন্য এনজিও কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠান যেমন, এনজিও ফাউন্ডেশন, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নিবন্ধন রয়েছে। এছাড়া সরকারি ট্রাস্ট হিসেবে নিবন্ধিত এনজিওও বিসিসিটিএফ হতে প্রকল্প পেয়েছে। অন্যদিকে প্রকল্প প্রাপ্ত এনজিওদের মধ্যে মোট ৭টি এনজিও'র কর্মকাল ৩০ বছর বা তার কম, তবে বয়সের ভিত্তিতে নবীন বিশেষ করে যাদের কর্মকাল ৫-১০ বছরের মধ্যে এমন এনজিওর সংখ্যা প্রায় ২৩টি (সারণি ৭)।

সারণি ৭: এনজিও'র অভিজ্ঞতা

এনজিও'র অভিজ্ঞতা	এনজিও/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
৩০ বছর বা তার কম	৭
২০ বছর বা তার কম	২৫
৫-১০ বছর	২৩
মোট এনজিও	৫৫

তথ্য সূত্র: মুখ্য উত্তর দাতা, সরেজমিন পরিদর্শন, এনজিও ব্যুরো ও সমাজ সেবা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ২০১২ সালের এনজিও তথ্য বিশ্লেষণ, জুন ২০১৩

সরেজমিন পরিদর্শনে ২টি এনজিও পাওয়া যায় যাদের প্রধান কার্যালয়ে যথাযথ আর্থিক এবং প্রশাসনিক অবকাঠামো নেই। পর্যাপ্ত তহবিল না থাকায় প্রতিষ্ঠানের এমন আর্থিক দৈন্যতা বলে জানান প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী। তবে কর্মি ও জনবলের হিসাবে কিছু এনজিও প্রাথমিকভাবে ভাল প্রতীয়মান হলেও তাদের ভিন্ন কর্মক্ষেত্র এবং জলবায়ু তহবিল নিয়ে কাজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ

২১টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়নি। বাস্তবে প্রকল্পগুলো বিসিসিটিএফ'র প্রকল্প প্রস্তাবের চাহিদার বিপরীতে এনজিওদের মাধ্যমে তৈরিকৃত প্রকল্প প্রস্তাব। ফলে প্রকল্পগুলো আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুসাওে না করে এনজিওদের চাহিদা নির্ভর করা হয়েছে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্বায়ন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের সুফল নিশ্চিত করা হয় নি। অন্যদিকে অধিকাংশ এনজিও ৪.৫- ৫ কোটি টাকার প্রস্তাব জমা দেয় এবং বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্ম পরিকল্পনা প্রদান করে। তবে, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা না করেই সংশোধিত বাজেট ২০-৩০ লক্ষ টাকায় সংকুচিত করায় কর্ম পরিকল্পনার সাথে বাজেটের সামঞ্জস্য থাকে নি। ফলে, এনজিওগুলো অনুমোদিত তহবিল এবং

বক্স ৪: প্রকল্প প্রস্তাবের মান

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ৫৫টি এনজিও'র নিকট প্রকল্প প্রস্তাবের জন্য আবেদন করলেও মাত্র ২১টি এনজিও প্রকল্প প্রস্তাব পাঠায়, অন্য ৩৪টি এনজিও চিঠির কোনো উত্তর দেয় নি। গবেষণার আওতায় মোট ২১টি এনজিও প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৭টি প্রকল্প প্রস্তাব অত্যন্ত দুর্বল মানের যা ২-৩ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোনো প্রকল্প প্রস্তাবে প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনার বিভাজন ও কর্ম প্রক্রিয়া দেয়া হয় নি। ফলে, প্রকল্পের কাজের প্রকৃত মাত্রা ও ফলাফল নির্ধারণ করা কঠিন। প্রকল্প প্রস্তাবগুলোতে শুধুমাত্র কাজের বিপরীতে অর্থের বিভাজন দেখানো হয়েছে, কিন্তু প্রকল্প থেকে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে প্রকল্পের উপযোগিতা, প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ও সুবিধাভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি, প্রকল্পের ফলাফল এবং ফলাফল মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রকল্প থেকে প্রদত্ত বিভিন্ন উপকরণ (যেমন, স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ঘর, রোপনকৃত গাছ, সৌরচুল্লী, কার্বণ সাশ্রয়ী চুল্লী, বায়োগ্যাস প্লান্ট ইত্যাদি) রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি এবং তা থেকে অব্যাহত সুবিধা নিশ্চিত করা সম্পর্কিত কোনো কর্ম পরিকল্পনা প্রদান করা হয় নি। অন্যদিকে, প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের আগে অধিকাংশ প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধন করা হয়। সংশোধনের জন্য এনজিওগুলোকে কিছু নতুন বিষয় সংযোজন বিয়োজনের ক্ষেত্রে যে নির্দেশনা দেওয়া হয় তাতে প্রকল্প প্রস্তাব প্রদানকারী এনজিও'র কোনো ধরনের অংশগ্রহণ ছিল না (সূত্র: টিআইবি'র নিজস্ব গবেষণা ও মুখ্য তথ্যদাতা ২০১৩)।

প্রদত্ত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে আগ্রহী নয়।

নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে জবাবদিহিতা

প্রতিটি এনজিও'র নির্বাহী পরিষদ রয়েছে এবং নিয়মিত সভার মাধ্যমে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মানা হয় না। মোট ৪০টি এনজিও থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ১০টি এনজিওতে নির্বাহী পরিষদের কোনো সভা হয় না বলে তথ্য দাতা জানান। অধিকাংশ এনজিও নির্বাহী পরিষদের সভার বিবরণী নথিভুক্ত করে না। কিছু এনজিও'র নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা জানান, সাধারণত বাৎসরিক সভা অথবা কোনো প্রকল্পের সভায় অংশগ্রহণ ছাড়া এনজিও'র নীতি নির্ধারণে তাদের কোনো ভূমিকা থাকে না।

চিত্র ৬: নির্বাচিত এনজিও'র কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা

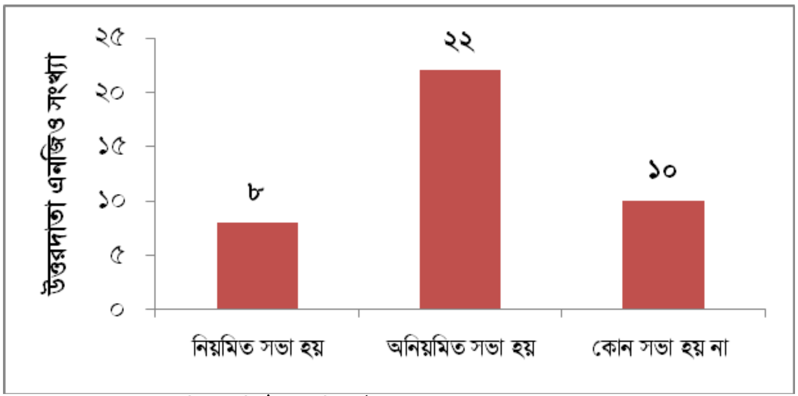

সূত্র: সরেজমিন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, ২০১৩

এনজিওগুলো আর্থিক প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ না করলেও নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রয়োজনে প্রতিবেদন জমা দেয়। নির্বাচিত এনজিওদের একটি বড় অংশ দায়সারাভাবে উপজেলা ও জেলা অফিসে একটি আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিয়ে থাকে (মুখ্য উত্তরদাতা, ২০১৩)।

প্রাতিষ্ঠানিক সততার চর্চা

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালার ৪(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে এনজিওগুলোকে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা প্রমাণের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ নিরীক্ষিত প্রতিবেদন জমা দিতে হয়

বক্স ৫: প্রাতিষ্ঠানিক সততার চর্চা

জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল থেকে প্রকল্প প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাবনার একটি প্রতিষ্ঠান মহিলা অধিদপ্তরের একটি প্রকল্প থেকে সেলাই মেশিন বিতরণের কাজ পেয়েছিল। মহিলা অধিদপ্তর থেকে প্রতিষ্ঠানটির কাছে স্থানীয় সুবিধাভোগীদের নাম দিতে বলা হয়। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কিছু প্রতিবন্ধী সুবিধাভোগীর নামের তালিকা জমা দেয় এবং তালিকা অনুসারে মহিলা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠানটিকে সেলাই মেশিন দিলেও প্রতিষ্ঠানটি প্রাপ্ত সেলাই মেশিনগুলো সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণ না করে বিক্রি করে দেয়। স্থানীয় তথ্য দাতাদের মতে, একই প্রতিষ্ঠান একটি বিদেশী এনজিও তহবিলের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থায় সুশাসন সংক্রান্ত প্রকল্পের কাজ করেছিল। সে প্রকল্পে প্রতিষ্ঠানটি তাদের ৭-৮ জন কর্মীর নির্ধারিত বেতন সম্পূর্ণ পরিশোধ না অর্ধেক বেতন প্রদান করে এবং বাকি টাকা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী চেকের মাধ্যমে প্রতি মাসে উঠিয়ে নেয়। পরবর্তীতে স্থানীয় জনগণ ও প্রশাসন বিষয়টি জানার পর তহবিল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত প্রকল্পটি বন্ধ ও বাতিল করে দেয়। কিন্তু তারপরও প্রতিষ্ঠানগুলো বিসিসিটিএফ হতে অর্থ পেয়েছে (মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং মাঠ পরিদর্শন, ২০১৩)।

এবং যা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাথমিক ভাবে প্রদান করেছে বলে প্রতীয়মান হলেও ২টি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অব্যবস্থাপনার তথ্য পাওয়া যায়। অর্থিক অব্যবস্থাপনার মধ্যে অন্যতম হল ত্রাণ প্রকল্পের টাকা আত্নসাৎ, ভুয়া নথি তৈরি, ভুয়া নির্বাহী কমিটি তৈরি করে নিজের আত্নীয় স্বজনদের কমিটিতে স্থান দেওয়া, প্রকল্পের কাজ না করে টাকা সরিয়ে ফেলা, সেবাগ্রহীতার নামে ও বিভিন্ন সুবিধা বাবদ বরাদ্দকৃত টাকা আত্মসাৎ। টাঙ্গাইলের একটি নির্বাচিত এনজিও ২০০৭ সালে ইউএনডিপি'র পরিচালিত ত্রাণ প্রকল্পের ১৯ লক্ষ টাকা আত্নসাৎ করার পর বিষয়টি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ হয় এবং পরবর্তীতে জেলা সমাজসেবা অফিস এর জেলা কর্মকর্তার নির্দেশে প্রতিষ্ঠানের সনদ ও নিবন্ধন বাতিল হয়। এমনকি ভুয়া নথি তৈরি করার জন্য নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা জেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে এনজিওটির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছিল[১৫]। স্থানীয় একটি এনজিও প্রতিনিধি ও এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিরা জানান, প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ থেকে শুরু করে সবার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে, কিছু এনজিও পরিচালনায় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের স্ত্রী অথবা আত্মীয়রা প্রধান নির্বাহী এবং পরিচালনা পর্ষদে স্থলাভিষিক্ত রয়েছে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে একাধিক এনজিওতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিদেরসম্পৃক্ততা রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে আত্মীয় স্বজনদের নামে ঋণ উঠিয়ে ঋণের টাকা ফেরত না দেওয়া, মাইক্রোক্রেডিট অথরিটির ঋণ কার্যক্রম স্বচ্ছভাবে পরিচালনায় ব্যর্থতার দায়ে সনদ বাতিল হয়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে ।

৭.২ নির্বাচিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে সুশাসন পর্যবেক্ষণ(সার্বিক)

রাজনৈতিক প্রভাব

খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য অনুমোদিত প্রকল্পের মাধ্যমে মোট বরাদ্দের ৩৮.৪৮ ভাগ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। ১৩টি প্রকল্পে মোট ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সুবিধা বিনামূল্যে পাওয়ার জন্য সুবিধাভোগী নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব বা ক্ষমতার অপব্যবহার প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন।

এনজিও/বেসরকারিপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ

পিকেএসএফ এর সিদ্ধান্তের ওপর নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে। জলবায়ু তহবিল থেকে প্রকল্প প্রাপ্ত একটি এনজিও'র নির্বাহী জানান,"বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, বিসিসিটি পিকেএসএফকে মোট ১৩১টি প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেয়,

বক্স ৬: অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত জটিলতা

অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং প্রকল্প অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে এনজিওরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে কারণ, এনজিওগুলোকে প্রকল্প বাস্তবায়নে পিকেএসএফ'র নিজস্ব যে প্রক্রিয়া আছে তা মেনে চলতে হয়। এনজিও চুক্তিপত্রের ১.৭ ধারায় বলা হয়েছে, প্রকল্পের অর্থ শুধুমাত্র প্রাপকের হিসাবে প্রদেয় চেকের মাধ্যমে খরচ করতে হবে, তবে যে সকল খাতে নগদ অর্থ ব্যয় করা যাবে, সেসব খাতে প্রতি খাতে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৩,০০০ টাকা খরচ করা যাবে। উল্লেখ্য, নগদ ব্যয়ের পরিমাণ প্রতি মাসে ৮০ হাজার টাকার বেশি অনুমোদনযোগ্য নয়। এর ফলে এনজিওগুলো তাদের চাহিদা ও প্রকল্পের প্রয়োজন অনুসারে অর্থ ব্যয় করতে সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে। একজন নির্বাহী জানান, তাদের প্রকল্পে গাছ লাগানোর জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, প্রকল্পের মেয়াদ শেষের দিকে চলে আসলেও নিজস্ব বীজতলায় যে চারা উৎপাদন করা হয়েছে তা এখনো লাগানোর উপযোগী হয় নি। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্প সঠিকভাবে ও সময়মত শেষ করতে হলে অন্য কোনো বীজতলা থেকে পরিপক্ক চারা ক্রয় করতে হবে এবং লাগাতে হবে। চারা ক্রয়ের জন্য এনজিওটির আগামী দু' মাসে প্রকল্পের ৫০ শতাংশ অর্থ খরচ করতে হবে। এ অবস্থায়, প্রতিষ্ঠানটি উপরোক্ত শর্তের কারণে চারা ক্রয় করতে পারছেন না। কিন্তু বিষয়টি সমাধানে পিকেএসএফ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় নি (তথ্যসূত্র: মুখ্যতথ্যদাতা, ২০১৩)।

১৫ এবিষয়ে টিআইবি কর্মকর্তাদের কাছে লিখিত সেই অভিযোগপত্র রয়েছে

প্রতিষ্ঠানগুলো মূল্যায়নের পর পিকেএসএফ ৪৮টি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করে যাদের ন্যূনতম সামর্থ্য আছে বলে বিবেচিত হয়। পিকেএসএফ'র মূল্যায়নে বাঁকি ৭ টি প্রতিষ্ঠান তহবিল প্রদানের জন্য অনুপযোগী বলে বিবেচিত হলেও তারা প্রকল্প বরাদ্দ পেয়েছে। কেন এ প্রতিষ্ঠানগুলো নির্বাচন করা হয়েছে এবং কিসের ভিত্তিতে নির্বচিত হয়েছে তা পিকেএসএফএর কাছেও বোধগোম্য নয়"[১৬]। প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকল্প পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না বলেও বেশকিছু এনজিও প্রতিনিধি অভিমত দেন। অন্যদিকে, বিসিসিটিএফ পরবর্তীতে আরও যে ৮টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে তা নির্বাচনের এখতিয়ার পিকেএসএফ'র ছিল না। এ বিষয়ে পিকেএসএফ উল্লেখ করেছে "ট্রাস্টি বোর্ড পরবর্তীতে আরোও ৮টি এনজিওসহ সর্বমোট ৬৩টি এনজিওর অনুকূলে অর্থ ছাড়করণের দায়িত্ব পিকেএসএফকে প্রদান করে"[১৭]।

আর্থিক নীতিমালার অস্পষ্টতা

অধিকাংশ এনজিও প্রকল্পে অর্থ ছাড় শুরু হয় ২০১২ সালের নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে এবং প্রকল্পগুলোর সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ বছর। প্রকল্পের অর্থ ৩টি কিস্তিতে প্রদান করার নিয়ম রয়েছে। পিকেএসএফ এবং এনজিও প্রদত্ত তথ্য অনুসারে অধিকাংশ এনজিও বর্তমানে প্রকল্প তহবিলের ২য় কিস্তির টাকা ব্যবহার করছে। মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকারে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের দাবি, বর্তমানে মোট কাজের ৫০-৬০ ভাগ শেষ হয়েছে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠানের দাবি, তাদের প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্রুত ছাড় না করায় এবং কাজের পরিমাণ 'কম হওয়ায়' তা দ্রুত শেষ করার জন্য অন্য প্রকল্পের অর্থ জলবায়ু তহবিলের প্রকল্পে ব্যবহার করেছেন । উল্লেখ্য, এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালার ১০ নং অনুচ্ছেদের (ঘ) ধারায় এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ছকের কথা বলা হলেও কোন প্রতিষ্ঠানের (পিকেএসএফ/বিসিসিটি) আর্থিক ব্যবস্থাপনার নিয়ম নীতি মেনে চলবে তা উল্লেখ নেই। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ'র সাথে এনজিও চুক্তিপত্রের ১.৭ ধারা অনুসারে পিকেএসএফ প্রকল্প অর্থ অবমুক্ত করে এবং চুক্তিপত্রের ধারা অনুসারে এনজিওগুলো প্রকল্প বাবদ প্রতিদিন ও মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি অর্থ খরচ করতে পারে না। ফলে প্রকল্প বাবদ প্রয়োজনীয় ক্রয় ও আনুষঙ্গিক খরচের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হচ্ছে (বক্স ৬ দেখুন)।

তদারকি এবং মূল্যায়নে ঘাটতি

মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করে এনজিও প্রকল্প বাস্তবায়নে তদারকি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে-

- জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পিকেএসএফ অথবা

> **বক্স ৭: ঋণের ফাঁদে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী**
>
> বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত সোলার এনার্জি, কার্বন সাশ্রয়ী চুলা, বায়োগ্যাস, নলকূপ ও বিভিন্ন উপকরণ প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠী ব্যক্তিগতভাবে আবার কোনোটি কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে। অধিকাংশ প্রকল্প প্রস্তাবে সুবিধাভোগী নির্বাচন পদ্ধতি, সুবিধাভোগীর ধরন, প্রদত্ত সুবিধাগুলোর দীর্ঘস্থায়ীত্ব ও ব্যবহার উপযোগিতা নির্ধারণে সঠিক কোনো পরিকল্পনা ও দিক নির্দেশনা নেই। এ সুযোগ গ্রহণ করে একটি এনজিও সৌর শক্তি চালিত ও কার্বন সাশ্রয়ী চুলা এবং প্রকল্পের অন্যান্য সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত ও জলবায়ু পরিবর্তনে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে বিতরণ না করে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ করছে; এবং দামের ৫০% ঋণ হিসাবে এবং ৫০% বিনামূল্যে প্রদান করছে। ফলে, প্রকল্পের সুবিধা প্রকৃত জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তরা না পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল (মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং মাঠ পরিদর্শন, ২০১৩)।

[১৬] টিআইবি প্রতিবেদন প্রকাশের পর পিকেএসএফ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য বিবরনী, নভেম্বর ২০১৩
[১৭] পূর্বোক্ত

কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী এখন পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তদারকি, পরিদর্শন এবং মূল্যায়ন করে নি (মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার, জুন ২০১৩)। ফলে এনজিওগুলো কোথায় কোন ধরনের কাজ করছে তার স্বচ্ছতা ও সত্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি;

- পিকেএসএফ তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো প্রকার অর্থ গ্রহণ করছে না। ফলে, প্রকল্পগুলোর মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও মূল্যায়নের অর্থায়ন কীভাবে পিকেএসএফএ'র মত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বহন করবে সে বিষয়টিও প্রকাশ করা হয় নি;
- এনজিওগুলো প্রতি কিস্তির অর্থ চেয়ে আবেদনের সাথে অর্থ ব্যয়ের হিসাব ও অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিয়ে থাকে। অন্যদিকে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে পিকেএসএফএ'র কাছে প্রেরণের বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকলেও পিকেএসএফ এখন পর্যন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া এবং প্রকল্প অর্থ ব্যয়ের কোনো নির্ধারিত ছক নির্বাচিত এনজিওগুলোকে প্রদান করে নি;
- পিকেএসএফ থেকে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য কোনো নির্দেশিকা না দেয়ার কারণে এনজিওগুলো তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রতিবেদন জমা দিয়ে থাকে বলে বেশ কিছু এনজিও প্রতিনিধি জানান। ফলে তহবিল ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে যে তথ্য আসছে তা একত্রিত করে অগ্রগতির সঠিক চিত্র/ধারণা পাওয়া সম্ভব না। এ বিষয়ে বিসিসিটি/পিকেএসএফ কর্তৃক কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে না।

৭.৩ নির্বাচিত এনজিও/বেসরকারি প্রকল্পে সুশাসন পর্যবেক্ষণ

৭.৩.১ বনায়ন প্রকল্প

বিসিসিটিএফ থেকে নির্বাচিত মোট ৫৫টি এনজিও/বেসরকারি প্রকল্পের মধ্যে ২০টি চারা উত্তোলন, বৃক্ষ রোপন ও বনায়নের সাথে সম্পৃক্ত। মোট প্রকল্প অর্থের ২১.১৭ ভাগ অর্থ প্রশমন ও কার্বন-সাশ্রয়ী উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে যার মধ্যে অধিকাংশ প্রকল্প বৃক্ষ রোপনের সাথে সম্পৃক্ত। প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে ফলজ, ঔষধি এবং কাষ্ঠল গাছের নার্সারি তৈরি এবং সুবিধা গ্রহণকারী পরিবারের মধ্যে ও রাস্তার পাশে তা রোপন করা হবে। প্রকল্পগুলো চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, বান্দরবন, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর ও পিরোজপুর জেলায় বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের সুবিধাভোগীরা বনায়নের কাজ করবে এবং এজন্য তাদের বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ আছে। উত্তরাঞ্চলে বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ ও প্রকল্পের কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে এনজিও প্রতিনিধিরা জানান, তাদের কর্ম এলাকাগুলো অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির কারণে দুর্যোগপ্রবণ, তাই দুর্যোগ রোধে এমন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতে প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে না এবং প্রকল্পের ফলাফল সুদূরপ্রসারী হবে না তার কারণ নিম্নে আলোচনা করা হলো-

বক্স ৮: বনায়ন বাবদ তহবিল বরাদ্দের কার্যকারিতা

বিসিসিটিএফ থেকে নির্বাচিত ৬৩টি প্রকল্পের জন্য বনায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহে মোট তহবিলের ২১.১৭% বরাদ্দ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে জানা য়ায়, কিছু বনায়ন প্রকল্পে উত্তোলিত চারার পরিমাণ উল্লেখ থাকলেও চারা লাগানোর জন্য মোট জায়গার পরিমাণ উল্লেখ নেই। চারা উত্তোলন থেকে বনায়ন পর্যন্ত একই ধরনের অন্য কোনো প্রকল্পে চারা প্রতি বরাদ্দ ১০ টাকা, আবার কোন প্রকল্পে তা ৬৪ টাকা। তাছাড়া, ২ টি প্রকল্পে গাছ পাহারা দেয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকলেও একই ধরনের অন্য প্রকল্পে এ বাবদ অর্থ বরাদ্দ নেই। এমনকি বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছের তুলনায় উৎপাদন মূল্য কম হওয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আগ্রাসী প্রজাতির গাছ (ইপিলইপিল, ইউক্যালিপটাস, বাবলা) রোপন করা হয়েছে যা পরিবেশের ক্ষতি করবে (সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, জুন ২০১৩)।

সক্ষমতা ও প্রকল্প কর্যক্রমে জবাবদিহিতার ঘাটতি: বনায়ন প্রকল্পের মধ্যে ১টি এনজিওর প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় অফিস নেই এবং প্রকল্পটির মেয়াদ ১২ মাসের বেশি হলেও প্রস্তাবিত কর্ম এলাকায় অংশিক কাজ করেই প্রকল্প সম্পূর্ণ/কাজ শেষ হিসাবে দেখানো হচ্ছে বলে জানা যায় (মাঠ পরিদর্শন, জুন ২০১৩);

বৃক্ষ রোপন এবং প্রকল্প কাজের ফলাফলে অনিশ্চয়তা: এনজিওগুলোকে প্রকল্পের আওতায় একটি সাধারণ বাজেট ধরে গাছ লাগানোর জন্য বরাদ্দ দিলেও প্রকল্পের আওতায় গাছের পরিমাণ, চারা রোপন থেকে চারা উত্তোলন এবং পরবর্তীতে পরিচর্যার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি। ফলে এনজিওগুলো খরচ কমানোর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগ্রাসী প্রজাতির (ইপিলইপিল, বাবলা, ইউক্যালিপটাস) গাছ লাগানোকে প্রাধান্য দিচ্ছে। অন্যদিকে, রাস্তার পাশে বনায়নের ক্ষেত্রে চারার সঠিক পরিচর্যা অপরিহার্য হলেও এ বাবদ কোনো বরাদ্দ রাখা হয় নি। ৪টি প্রকল্পে স্থানীয় জনগণের রক্ষণাবেক্ষণের দয়িত্বের কথা বলা হলেও স্থানীয় জনগোষ্ঠী মতামত দেন, "রাস্তার পাশে গাছ লাগানো হলে স্থানীয় জনগণের কোনো ধরনের মালিকানা বোধ তৈরি হয় না। ফলে গাছের পরিচর্যা করার কেউ থাকে না এবং অধিকাংশ গাছ মারা যায়।"

অপর্যাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকাল: বৃক্ষ রোপন প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে ৩ টি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ জানান, তাদের কাজের ক্ষেত্রে বড় বাধা হলো প্রয়োজনের তুলনায় প্রকল্প তহবিল কম। ২০১২ সালে প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ার পর বীজতলা তৈরি এবং চারা রোপণের উপযোগী/পরিপক্ক হওয়ার জন্য যে সময় ও অর্থের প্রয়োজন ছিল তা প্রদান করা হয় নি। ফলে, এনজিওগুলো প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে বৃক্ষ রোপন করতে পারবে কি না সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে। ইতিমধ্যে বৃক্ষ রোপণের সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় বর্ষাকালের পরে চারা রোপনের সুযোগ থাকবে না।

৭.৩.২ "ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু গৃহ নির্মাণ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প"

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে একটি জাতীয় পর্যায়ের এনজিও ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রকল্প পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৭ সালে এনজিও ব্যুরো ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নিবন্ধন নিয়ে ৫টি জেলায় (ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার ও বরিশাল) কাজ করলেও চট্টগ্রামে তাদের কোনো নিজস্ব অফিস নেই। বর্তমানে মোট ৬৫ জন স্থায়ী কর্মী এবং ৮টি শাখা রয়েছে। এনজিওটি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ব্রাক (শিক্ষা কর্মসূচি) এবং এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে স্বাস্থ্য প্রকল্পে কাজ করে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে এনজিওটির সরাসরি কোনো অভিজ্ঞতা নেই এবং পিকেএসএফ'র সাথে আগে কখনো কাজ করে নি। তবে ১৯৯১, ১৯৯৮, ২০০৪ সালে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার সময় ত্রাণ বিতরণের কাজ করেছে এবং বাড়ি, সাইক্লোন শেল্টার, মসজিদ, মন্দির তৈরি ও মেরামতের কাজ করেছে।

প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন: প্রাথমিকভাবে ৫ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার প্রকল্প প্রস্তাব বিসিসিটিতে দেওয়া হলেও ত্রাণ ও পুণর্বাসন অধিদপ্তরের ২০০৯ সালের একটি নকশা অনুসারে কাজ করতে বলা হয় এবং সে অনুসারে বাজেট প্রদান করা হয়। চূড়ান্তভাবে ৫ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাবের বিপরীতে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে শুধু চট্টগ্রামে প্রকল্প কর্ম এলাকা সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। পরে বিসিসিটি থেকে প্রকল্প এলাকা বাড়িয়ে আইলা ও সিডর আক্রান্ত খুলনা ও বাগেরহাটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সে প্রেক্ষিতে ২০০টি ঘর নির্মাণে বাজেট বাড়িয়ে প্রতি ঘর বাবদ ১,৩৬,৩৭৩ টাকা এবং অন্যান্য খরচ হিসাবে সর্বমোট ২.৪২ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদিত হয়। নির্মাণ সামগ্রীর দাম বাড়ায় পরবর্তীতে পিকেএসএফ সমপরিমাণ বাজেটে ১৬০টি ঘর নির্মাণ করতে প্রতিষ্ঠানকে সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

প্রশ্নবিদ্ধ অনুমোদন: একই বিসিসিটিএফ এর কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যেমে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ছাড়াই দু'ধরনের জলবায়ু সহিষ্ণু ঘর (বক্স ৯) কোন যুক্তিতে অনুমোদন কার হয়েছে তার কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। বাস্তবে কোনটি জলবায়ু সহিষ্ণু ঘর তা প্রশ্নের দাবি রাখে।

অস্বচ্ছতা: প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা, সুবিধাভোগী এবং ঘরের নকশা নির্বাচনে কী কী নির্ধারকসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে সে সংক্রান্ত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ নেই।

প্রকল্প এলাকায় নিজস্ব অফিস না থাকা: প্রতিষ্ঠানের ৪টি প্রকল্প এলাকার মধ্যে চট্টগ্রামসহ ৩টি এলাকায় নিজস্ব অফিস নেই যা নীতমিালার[১৮] লঙ্ঘন। চট্টগ্রামে (রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী) অন্য একটি সহযোগী এনজিও 'এস' এর অফিস ব্যবহার করে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত হলেও সে সংক্রান্ত কোনো অনুমতি বা প্রকল্প প্রস্তাবে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ নেই। অথচ অন্যদিকে, খুলনা ও বাগেরহাটে অন্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কাজ করা হবে বলে জানা যায়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ২ জন প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে। তবে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালার ৭ নং অনুচ্ছেদের (খ) ধারায় বলা হয়েছে, কোন এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে দাখিলকৃত একটি মাত্র গ্রহণযোগ্য প্রকল্প মঞ্জুর করা হবে এবং যৌথভাবে দাখিলকৃত প্রকল্পে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগের বিষয়টি প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ করতে হবে যা উল্লেখিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে মানা হয়নি ।

বক্স ৯: একই বিসিসিটিএফ হতে বরাদ্দকৃত অর্থে দু'ধরনের জলবায়ু সহিষ্ণু ঘর অনুমোদন!!

এনজিও তহবিলের আওতায় অনুমোদিত জলবায়ু সহিষ্ণু ঘর	**দুর্যোগ এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয় নির্মিত জলবায়ু সহিষ্ণু ঘর**
ঘরের সংখ্যা: ১৬০ টি **খরচ:** প্রতি ঘর নির্মাণ ১,১১,৩৭৩ টাকা, শৌচাগার নির্মাণের জন্য ১৫ হাজার টাকা, নলকূপ বসানো বাবদ খরচ হবে ১০ হাজার টাকা	**খরচ:** প্রতি ঘর নির্মাণ বাবদ ১,২০,০০০ টাকা বরাদ্দ

সূত্র: মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং মাঠ পরিদর্শন, ২০১৩

প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজনৈতিক প্রভাব এবং জবাবদিহিতা: ঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৬০টি ঘর (ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের ২০০৯ সালের নকশার ভিত্তিতে) ও কমিউনিটি ভিত্তিক ১০টি টিউবয়েল বসানোর সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। কমিউনিটি ভিত্তিতে ১০টি পরিবার (যারা ঘরের সুবিধা পাবে) ১টি নলকূপ ব্যবহারের সুযোগ পাবে। প্রতিটি ঘরে ৮টি আরসিসি পিলার থাকবে এবং ঘর নির্মাণে ১,১১,৩৭৩ টাকা, শৌচাগার নির্মাণের জন্য ১৫ হাজার টাকা এবং নলকূপ বসানো বাবদ ১০ হাজার

[১৮] জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালার ৩ (ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে "আবেদনকারী এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপন, পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীবন-জীবিকা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং উপযুক্ত প্রশাসনিক জনবল থাকতে হবে। অন্যথায় কোন এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ বরাদ্দের জন্য বিবেচন করা হবে না"

টাকা সহ প্রতিটি পরিবার/প্যাকেজের জন্য মোট ১,৩৬,৩৭৩ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ৩ জন এবং চট্টগ্রামে নিয়োজিত সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ২ জন কর্মকর্তা রয়েছেন যারা নির্দিষ্ট কয়েকটি নির্ধারকের[১৯] ভিত্তিতে সুবিধাভোগী নির্বাচনে নির্দেশনা দিয়েছেন।

- দু'টি ভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি এবং প্রকল্প প্রাপ্ত এনজিও'র কর্মকর্তার সূত্রে জানা যায়, প্রকল্পটি রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে অনুমোদন দেওয়ায় প্রকল্প বাবদ বেশি অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে;
- প্রকল্পের জন্য কোনো নতুন কর্মী নিয়োগ করার বিধান না থাকায় এবং প্রকল্পের জন্য ১জন মাত্র ডিপ্লোমা প্রকৌশলী নিয়োগ করায় সব প্রকল্প এলাকায় প্রতিষ্ঠানটি একযোগে কাজ করছে না। যখন যেখানে নির্মাণ কাজ শুরু হয় তখন সে প্রকৌশলী সে এলাকায় থাকে যা প্রকল্প কাজকে বিলম্বিত করছে;
- বাস্তবায়ন এলাকা পরিদর্শনে দেখা যায়, প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখিত কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্পের ঘর নির্মাণ ও সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। তবে অতি দরিদ্র লোকদের ঘরগুলো দূরে দূরে অবস্থান করায় যোগাযোগ এবং পরিবহন একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং নির্মাণ সামগ্রী পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় কাজের উপর প্রভাব ফেলতে পারে;
- বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পটির কাজ একইসাথে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় বাস্তবায়ন হওয়ার কথা থাকলেও শুধু কক্সবাজারের রামু এবং চকরিয়ায় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় কাজ শুরু/প্রাথমিক পর্যায়ে হয়েছে। খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় প্রতিষ্ঠানের এনজিওটির নিজস্ব কোনো অফিস না থাকার কারণে এখন পর্যন্ত কাজ শুরু হয়নি।

তহবিল প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরিদর্শন ও নিরীক্ষা: প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্প কাজ নিয়মিত পরিদর্শন করলেও পিকেএসএফ এর পক্ষে কোনো কর্মকর্তা প্রকল্প কাজ পরিদর্শন করে নি। তবে প্রতিষ্ঠানটি পিকেএসএফ অফিসে অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে এবং প্রকল্পগুলোর সঠিক মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারলে প্রকল্পের টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

[১৯] ক) দরিদ্র: যিনি দিনে ১০০ টাকা আয় করেন এবং কায়িক পরিশ্রম করে থাকেন অথবা বছরে যার আয় ১২ হাজার টাকার উপরে নয় অথবা যাদের আবাদি জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশ এবং বর্গাচাষী; খ) অতিদরিদ্র: নিজস্ব জমি নেই, বর্গাচাষ করে না এবং ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে; পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম মহিলা, তাদের অগ্রাধিকার; বছরের অধিকাংশ সময় সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে এবং দরিদ্র জেলে পরিবার; গ) ঘরটি নকশা অনুসারে তৈরি করতে হবে এবং টয়লেট বসানোর জায়গা থাকতে হবে; ঘ) উপকারভোগীরা অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করবেন যে, তারা ঘরটি বিক্রি করবে না; ঙ) একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি ঘর পাবে না এবং অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঘর পেলে সে পরিবার আর ঘর পাবে না; চ) সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে মারা গেছে অথবা নিখোঁজ হয়েছে এমন পরিবার প্রাধান্য পাবে।

৭.৩.৩ "Drinking Water Supply and Sanitation for Climate Change Vulnerable Areas in Chittagong Particularly Anwara & Banskhali Upazilla" প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়কারী এনজিওটি ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত, এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত। ৭৪ জন কর্মী ১০টি শাখার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয় এবং চট্টগ্রাম জেলাতেই ১০টি অফিস আছে। প্রধানমন্ত্রীর গৃহায়ন তহবিল, এনজিও ফাউন্ডেশনের স্যানিটেশন তহবিল। ব্রাক এর শিক্ষা কার্যক্রমে ৩টি প্রকল্প বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবায়ন করছে এবং প্রতিষ্ঠানে ঋণ কর্মসূচি বিদ্যমান। জলবায়ু তহবিলে বাস্তবায়িত প্রকল্পটি নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব তহবিলে অধিকার বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি পানি এবং স্যানিটেশন কার্যক্রমে অভিজ্ঞতা থাকার কথা উল্লেখ করছে। পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য পরিদর্শনে এসেছিল তবে পিকেএসএফ'র সাথে প্রতিষ্ঠানটি আগে কখনো কাজ করেনি। প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৯০টি পরিবেশ বান্ধব শৌচাগার নির্মাণে প্রতিটির নির্মাণ ব্যয় ৪,২২০ টাকা ধরা হয়েছে।

ক) প্রকল্প প্রণয়ন এবং অনুমোদন

প্রকল্প অনুমোদনে যথার্থতা: এনজিওটি প্রথমদিকে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পের জন্য প্রায় ৫ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব জমা দিয়েছিলো, যার আওতায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের প্রস্তাব ছিলো, কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই অনুমোদিত মূল প্রকল্প প্রস্তাবে তা গ্রহণ করা হয়নি;

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ না করা: প্রকল্প প্রস্তাব তৈরিতে একজন বিশেষজ্ঞের সহায়তায় স্যাটেলাইট ইমেজ পর্যালোচনা করে জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নির্ধারণ করা হয় বলে দাবি করেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কিন্তু প্রকল্প প্রণয়নের সময় স্থানীয় জনগণের চাহিদার বিষয়ে কোনো মতামত গ্রহণ করা হয়নি (স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার, ২০১৩)।

বক্স ১০: একই অঞ্চলে দু'টি এনজিওকে দুই ধরনের শৌচাগারের জন্য বরাদ্দ

শৌচাগার নির্মাণ প্রকল্প
শৌচাগারের জন্য বরাদ্দ: ৪,২০০ টাকা
প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা: চট্টগ্রাম

ঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায়
শৌচাগারের জন্য বরাদ্দ: ১৫,০০০ টাকা
প্রকল্পএলাকা: কক্সবাজার, পটিয়া

সূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৩

খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন

প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী নির্বাচনের জন্য প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তা নেয়া হয়, পরে গ্রাম পর্যায়ে একজন প্রকল্প সুপারভাইজার সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ করেন। বাছাইয়ের মাধ্যমে সামর্থ্যবানদের নিজ উদ্যোগে শৌচাগার নির্মাণে উৎসাহিত করা হয় এবং যাদের সামর্থ্য নেই তাদের বিনামূল্যে পরিবেশ বান্ধব শৌচাগার প্রদান করা হয়।

অপর্যাপ্ত বরাদ্দ: এনজিও ফাউন্ডেশনের হিসাব অনুসারে একটি সাধারণ মানের শৌচাগার নির্মাণে ব্যয় হয় ৫,৪৬০ টাকা। বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের আওতায় শৌচাগারের দাম ৪,২২০ টাকা ধরা হয়েছে যার মাধ্যমে ভাল এবং টেকসই শৌচাগার নির্মাণ সম্ভবপর নয়। তাছাড়া, বরাদ্দ কম হওয়ার কারণে শৌচাগারগুলোর গুণগত মান নিশ্চিত করা যায় নি এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে তা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় জনগোষ্ঠী;

ব্যবহার সম্বন্ধে অসচেতনতা: শৌচাগারগুলো কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছালেও তার ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে না; কারণ প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অভ্যাসগত পরিবর্তনে কার্যকর সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। ফলে, শৌচাগার প্রাপ্ত অনেক পরিবারের সদস্যদের রাস্তা এবং উন্মুক্ত স্থানে মল ত্যাগের বিষয়টি পরিদর্শনে দেখা যায়। উল্লেখ্য, সচেতনতা বাবদ তহবিলের অপচয় হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে প্রকল্প প্রস্তাবে এ সংক্রান্ত কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয় নি।

ত্রুটিযুক্ত প্রকল্প পরিকল্পনা: সমস্ত এলাকাকে স্যানিটেশনের আওতায় না আনা হলে দুর্যোগকালীন সময়ে অল্প কিছু এলাকা বন্যায় অথবা বৃষ্টিতে প্লাবিত হয়ে গেলে শৌচাগার না পাওয়া দু'-একটি পরিবারের কারণে পুরো এলাকা দূষিত হয়ে প্রকল্পের সুফল বিনষ্ট হয়ে যাবে। সে বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় সব এলাকা কর্ম পরিধির মধ্যে নিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ না হওয়ায় বাস্তবায়িত প্রকল্প থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল আসবে না।

স্থানীয়ভাবে চাঁদাবাজি: এনজিওটির প্রকল্প ব্যয়ের ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ২ কিস্তির টাকা পেয়েছে এবং বর্তমানে প্রকল্পের মোট কাজের প্রায় ৬০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর কোনো সমস্যা না হলেও ২য় কিস্তির টাকা প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংক হিসাবে জমা হওয়ার পরের সপ্তাহে এলাকার রাজনৈতিক পরিচয়ে ২-৩ জন ব্যক্তি এনজিও প্রধানের কাছে ছাড়কৃত টাকার একটি নির্দিষ্ট অংশ (%) চাঁদা হিসাবে দাবি করে এবং টাকা প্রদানে চাপ প্রয়োগ করে।

গ) প্রকল্প পরিদর্শন ও নিরীক্ষা

পিকেএসএফ এখন পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর্যায়ে কোনো রকম পরিদর্শন করেনি এবং এনজিওটি তাদের নিজস্ব ফরমেটে অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা পিকেএসএফকে দিয়েছে।

৭.৩.৪ "অবলম্বন" প্রকল্প

চট্টগ্রাম থেকে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান পরিবেশ বান্ধব চুলা বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত **"অবলম্বন"** প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এনজিওটি সমাজ সেবা অধিদপ্তর, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধন নিয়ে ১৫০ জন কর্মী ও ৭টি অফিস নিয়ে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে পথ শিশুদের পুনর্বাসন, প্রতিবন্ধী এবং বিভিন্ন অধিকার বিষয়ক কাজ করছে এবং এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা রয়েছে। তাছাড়াও, সেভ দ্যা চিল্ড্রেন এর প্রভাতী প্রকল্প, ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের জীবন মান উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ প্রকল্প এবং ব্রাক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য ২২ টি স্কুলে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে বলে জানায়। তবে প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্প বাস্তবায়নের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। চুলা বিতরণ প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো, গ্রামের নারীরা খোলা চুলায় রান্না করে; ধোঁয়ার কারণে পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হয়। অন্যদিকে, রান্নার জন্য বেশি জ্বালানির দরকার হয় এবং তা পরিবেশ বান্ধব নয়। সব বিবেচনা করে তারা চুলা বিতরণের প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে।

ক) প্রণয়ন ও অনুমোদন

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ না করা: প্রকল্প গ্রহণের সময় স্থানীয় জনগণ এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে আগে কোনো আলোচনা করা হয় নি।

জলবায়ু পরিবর্তনের কম গুরুত্বপূর্ণ খাতে অর্থায়ন: প্রতিষ্ঠানটিকে চুলা বিতরণের প্রকল্প দেওয়া হলেও এ সংক্রান্ত নীতিমালার ৭(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে, কোনো এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আবেদন করার বিষয়ে উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে।

খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন

বিলম্বিত প্রকল্প কাজ: প্রকল্পটি ১ বছরের মধ্যে সমাপ্তের কথা বলা হলেও নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে ২ মাস বিলম্বে কাজ শুরু হওয়ায় কাঙ্খিত ফলাফল না পাওয়া যেতে পারে এবং নভেম্বর ২০১৩ এ কাজ সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও মাত্র ৪০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরুর আগে জেলা প্রশাসন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ইউপি সদস্যদের চিঠি দিয়ে অবহিত করার ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর পূর্বে খরচের ভিত্তিতে ১০ লক্ষ টাকার প্রকল্প বাজেট প্রস্তুতের কারণে এবং সংশোধিত বাজেট তৈরিতে প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ সুযোগ না থাকায় প্রকল্প শুরুর সময় চুলার দাম বেড়ে যাওয়ায় বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাজ সম্পন্ন করতে সমস্যা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা দাবি করেন যে, যেহেতু ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা আছে তাই ঠিকাদার নির্ধারিত দামে চুলা সরবরাহ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বক্স ১১: প্রকল্প সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যসমূহ

বিসিসিটিএফ প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ বান্ধব চুলা বিতরণ	গ্রামীণ শক্তি কর্তৃক চুলা বিতরণ
প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা: পেকুয়া **প্রকল্পে মোট অনুমোদন: ১০ লক্ষ টাকা** **মোট চুলার পরিমাণ: ৬৫০টি** **ইউনিট প্রতি গড় দাম: ১০০০ টাকা (প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত তথ্য)**	বাস্তবায়ন এলাকা: চকরিয়া **চুলার বিক্রয় দাম:** একমুখী ৭০০ টাকা দ্বিমুখী ৮০০ টাকা (মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত)

সূত্র: মাঠ পরিদর্শন, জুন ২০১৩

সুবিধাভোগী নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ: প্রতিষ্ঠানটির ঋণ কার্যক্রম থাকার কারণে প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন করা কঠিন। যদিও প্রতিষ্ঠানটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দাবি করেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রাথমিক জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং জরিপে প্রাপ্ত তথ্যর ভিত্তিতে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। তবে, নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ভিত্তিক মহিলা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত সুবিধাভোগী নির্বাচন করার কথা বললেও বাস্তবে তা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে নি (সূত্র: স্থানীয় উপকারভোগীর সাক্ষাৎকার, জুন ২০১৩)। তবে, এনজিও প্রতিনিধির মতে, সুবিধাভোগী নির্বাচনে কোনো সমস্যা হয়নি কারণ, উক্ত এলাকাতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনাধীন ১০টি স্কুল আছে এবং ঐসব এলাকায় তারা ২ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছে।

অর্থের সঠিক ব্যবহারে ঝুঁকি: প্রকল্প প্রস্তাবে প্রতিটি চুলার গড় খরচ ১,০০০ টাকা দেখানো হলেও বাস্তবে চুলাগুলোর গড় ক্রয়মূল্য ৭৫০-৮০০ টাকা। ফলে, প্রতিটি চুলার বিতরণ ব্যয়ের সাথে বাস্তব ব্যয়ের পার্থক্য ২০০-২৫০ টাকা, যা থেকে প্রকল্প তহবিলের প্রায় ১.৩৫ লক্ষ টাকা (২০০-২৫০ টাকা হিসাবে মোট ৬৫০ টি চুলার ভিত্তিতে) অব্যয়িত থাকার কথা। মাঠ পরিদর্শনে দেখা যায়, পিকেএসএফ'র পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের কোনো তদারকি বা নিরীক্ষা করা হয় নি। এ গবেষণার আওতায় জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটি ৭০০-৮০০ টাকায় ক্রয়কৃত চুলার দাম ১০০০ টাকা বলে উল্লেখ করেছে। তাছাড়া, প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয়ভাবে চুলা তৈরির খরচ বেশি হওয়ায় চট্টগ্রামের এক প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে চুলা সংগ্রহ করছে যদিও মাঠ পরিদর্শনে দেখা যায়, বাস্তবে স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত চুলার দাম এবং পরিবহন খরচ কম। অন্যদিকে, প্রকল্প প্রস্তাবে পরিবহন খরচ বাবদ আলাদা বরাদ্দ রাখা হলেও পরিবহনের টাকা সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে আদায় করা হয়।

বিতরণকৃত চুলার ব্যবহার উপযোগিতা: এনজিও কর্তৃক বিতরণের পর প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সেবা প্রদান প্রকল্প সমাপ্তের পর আর এই সুবিধা প্রদান করা হবে না। উল্লেখ্য, প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় সুবিধাভোগীদের নিয়ে ৫০ টি সামাজিক সচেতনতা কমিটি রয়েছে, যার মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের প্রকল্প এবং পরিবেশ বান্ধব চুলার ব্যবহার ও এর উপকারিতা

সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশিক্ষণ প্রদানের পরও অনেকে চুলা মেরামত করতে পারে না, ফলে তা দ্রুত ব্যবহার অনুপেযোগী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অভিযোগ গ্রহণ এবং সমস্যা নিরসন: এনজিও পরিচালিত স্কুলের জন্য এসএমসি'র নিয়মিত অভিভাবক সভা হয়; ফলে এলাকার সবার অভিযোগ, সমস্যা ও পরামর্শ শুনে খুব সহজে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় বলে দাবি করেছেন এনজিও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

গ) তহবিল প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরিদর্শন ও নিরীক্ষা

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প পরিদর্শন না করা: পিকেএসএফ প্রকল্প বাস্তবায়নরত অবস্থায় এর কার্যক্রম পরিদর্শন কওে নি বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়; ফলে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালার ১১ (খ) অনুচ্ছেদ এবং ১৫(খ) অনুচ্ছেদ অনুসাওে, কোনো প্রকার অনিয়ম ও অপচয় হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয় নি। উল্লেখ্য, এনজিওটি পিকেএসএফ এর সাথে আগে কখনো কাজ করেনি। ফলে পিকেএসএফ এর সাথে প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ এই প্রকল্পের মাধ্যমে কেবল শুরু হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে পিকেএসএফ এর ধারণা কম;

সুনির্দিষ্ট তদারকি গাইডলাইন না থাকা: পিকেএসএফ এর নিজস্ব কোনো রিপোর্টিং ফরমেট না থাকায় এনজিওটি নিজেদের ফরমেটে সমস্ত প্রতিবেদন জমা দিয়ে থাকে।

সার্বিকভাবে, এনজিও নির্বাচনে পিকেএসএফ'র স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ কম। প্রকল্প প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীদের মতে পিকেএসএফ এর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই এবং প্রতিষ্ঠানটি বিসিসিটিএফ'র "পোস্ট বক্স" হিসেবে কাজ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়াও, প্রকল্প অনুমোদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকৃত ঝুঁকিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিবেচনায় না করে এনজিও প্রদত্ত প্রস্তাব অনুমোদন করায় আক্রান্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত ও অংশগ্রহণের প্রতিফলন কম। প্রকল্প প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পগুলোর সংক্ষিপ্তসারে দেখা যায়, অধিকাংশ এনজিও সামাজিক বনায়ন এবং পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নিয়ে কাজ করছে। অন্যদিকে, এলাকা ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় উত্তরাঞ্চলে অধিকাংশ প্রকল্প পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং সামাজিক বনায়ন নির্ভর এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে প্রকল্পগুলোর সরাসরি যোগাযোগ নির্ণয় সাপেক্ষ। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই ২-৩ টি এনজিওকে অনেক বেশি বরাদ্দ দেওয়ার ফলে তুলনামূলক ভাল প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করার এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ প্রদানের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বায়োগ্যাস প্লান্ট, সৌল বিদ্যুৎ প্রদানের প্রকল্পে রাজনৈতিক প্রভাবের সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা জানান। ফলে, জলবায়ু তহবিলের টাকা প্রকৃত ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এ প্রকল্পগুলো কীভাবে সহায়ক হবে এবং সুবিধাভোগীরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কোনো ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন সে বিষয়গুলো প্রকল্প প্রস্তাব এবং সরেজমিন পরিদর্শনেও পরিষ্কার নয়। একই সাথে স্বচ্ছতার মাপকাঠিতে বিনামূল্য প্রদত্ত সুবিধাকে ঋণ নির্ভর প্রতিষ্ঠানের ঋণের সাথে শর্তযুক্ত না করার চ্যালেঞ্জও বিদ্যমান।

৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে তহবিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিসিসিআরএফ হতে তহবিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলো বাংলাদেশকে প্রতিশ্রুত তহবিলের চেয়ে কম বরাদ্দ দিয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জলবায়ু প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ হলো, প্রকল্প প্রণয়নে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পর্যাপ্ত সম্পৃক্ততা না থাকা, আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়হীনতা, প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব যাচাই না করা এবং প্রকল্পের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব চিহ্নিত না করা। সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নে যে চ্যালেঞ্জগুলি চিহ্নিত হয়েছে তা হলো ঋণ ও ক্ষতিপূরণের টাকায় বাস্তবায়িত প্রকল্প আলাদা না করা, ঠিকাদার নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব , নির্মাণ কাজে নিম্নমানের নির্মাণ উপকরণ প্রয়োগ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদারকি ও পর্যবেক্ষণে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অসম্পৃক্ততা।

এছাড়াও এনজিও প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে বেশকিছু ঝুঁকি পরিলক্ষিত হয়। এনজিও নির্বাচন এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনে প্রধান যেসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হয়েছে তা হলো, পিকেএসএফ কর্তৃক স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারা এবং ক্ষেত্র বিশেষে রাজনৈতিক ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ; প্রকল্প, কর্ম এলাকা এবং সুবিধাভোগী নির্বাচন এবং অনুমোদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকৃত ঝুঁকি বিবেচনা না করা, রাজনৈতিক বিবেচনা ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের উপস্থিতি; সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য এনজিও নির্বাচন না করা এবং কিছু ক্ষেত্রে অদক্ষ প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প বরাদ্দ দেয়া এবং প্রকল্প অনুমোদনে স্বচ্ছতার অভাব। এছাড়া এনজিও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এনজিও প্রকল্প বাস্তবায়নে যেসব ঝুঁকি পরিলক্ষিত হয় তা হলো, বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট এবং পরিমাপযোগ্য ফলাফল না থাকা এবং অস্বচ্ছতা; দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সঠিক জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকা; দীর্ঘমেয়াদী এবং সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার অভাব; প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা না থাকা; সঠিক তদারকি, পরিদর্শন এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি।

৯. সুপারিশমালা

৯.১ জলবায়ু তহবিলে সরকারি প্রকল্প

- নদী সুরক্ষা বা নদী হতে বর্জ্য অপসারণ সংক্রান্ত সকল প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে অবশ্যই এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সংস্থা যেমন, ঢাকা ওয়াসা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদিকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে;
- প্রকল্প তৈরীর পূর্বে অবশ্যই প্রকল্পের স্থায়িত্ব, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মতামত বিবেচনায় আনতে হবে;
- প্রকল্প নির্বাচন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে তথ্যের সর্বোচ্চ উন্মুক্ততা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;
- জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে সহজে অভিযোগ গ্রহণ এবং দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে;
- বিসিসিটিএফ বোর্ডের সভায় বোর্ডের সুশীল সমাজের আরো প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে হবে;

৯.২ এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন, প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন

- প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে পিকেএসএফকে নির্দিষ্ট নির্দেশিকার আওতায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ প্রদান করতে হবে;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য প্রকল্প নির্বাচন ও অনুমোদন প্রদানকারী কমিটির ছাড়াও একটি ওয়াচডগ বডি থাকতে হবে;
- যোগ্যতা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে এনজিও নির্বাচন করে প্রয়োজনীয় পরিমাণে তহবিল এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে যথার্থ সময় দিতে হবে;

- জলবায়ু তহবিল ব্যবহারে সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে কার্যকর সুরক্ষা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

তথ্য সূত্র

BCCT. (2010). *Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) Implementation Manual.* BCCRF.

BCCT. (2011). *Bangladesh Climate Change Resilience Fund; An Innovative Governance Framework.* Retrieved Januar 12, 2012, from Documents & Publications: http://www.bccrf-bd.org//Documents/pdf/one_pager_final_20Nov11[1].pdf

BCCSAP. (2009). *Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan.* Dhaka: Ministry of Environment and Forest.

BCCT. (2012). Interview With BCCT Officials (Z. H. Khan, M. Rouf, & M. Haque, Interviewers)

BCCT. (2012,). Interview With BCCT Officials. (Z. H. Khan, M. Rouf, & M. Haque, Interviewers)

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (২০১০) বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করিবার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে প্রণীত আইন, ২০১৩ সালে সংগৃহীত, মূল নথি - http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/Climate%20Change%20Trust%20Act_2010.pdf

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (২০১০) বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ড নীতিমালা ট্রাস্ট, ২০১২ সালে সংগৃহীত, মূল নথি - http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/CCTF%20Policy.pdf

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (২০১০) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১২ সালে সংগৃহীত, মূল নথি-http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/NGO%20Selection%20policy.pdf

MoEF. (2013). *Bangladesh Climate Change Trust.* Retrieved 2013, from http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/Approved%20Project%20-Update%20Up%20to%20April2013.pdf

MoEF. (2011). *Bangladesh Climate Change Trust.* Retrieved August 2012, from http://www.moef.gov.bd/html/climate%20change%20unit/IMG.pdf

MoEF. (2012, March 27). *Guideline for preparing project proposal, approval, amendment, implementation, fund release and fund use for government, semi-government and autonomous organizations under the Cliamte Change Trust Fund.* Retrieved February 25, 2013, from http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/Government%20Gazettes%20Climate%20Change%20Trust%20Fund%2023-02-2010.pdf

PKSF. (2012). Interview With PKSF Officials (Iftekharuzzaman, Z. H. Khan, & M. Rouf, Interviewers)

PKSF. (2012). List provided by PKSF under Right to Information (RTI) Law.

TI-Bangladesh. (2009). *Problems of Governance in the NGO Sector: The Way Out.* Retrieved May 13, 2013, from http://www.ti-bangladesh.org/research/ExecSum-NGO-English.pdf

White, S. C. (1999). NGOs, Civil Society, and the State in Bangladesh:The Politics of Representing the Poor. *Development and Change* , 307-326.

Zimmermann, M., Glombitza, K.-F., & Rothenberger, B. (2010). *Disaster Risk Reduction Programme For Bangladesh.* Bern: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এর এনজিও প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তিপত্র (সংগৃহীত ২০১৩)

সাপ্তাহিক (বর্ষ ৫ সংখ্যা ৪০, ২০১৩) http://www.shaptahik.com/v2/?DetailsId=7452

প্রথম আলো (২৩/০৩/ ২০১১) http://www.prothom-alo.com/detail/date/2011-03-23/news/140885

প্রথম আলো (০৩/০৯/ ২০১১) http://www.prothom-alo.com/detail/date/2011-09-03/news/140885

প্রথম আলো (১২/০৮/ ২০১২) http://www.prothom-alo.com/detail/date/2012-12-08/news/311487

সমাজসেবা অধিদপ্তর (২০১২-২০১৩) প্রকাশিত এনজিও তালিকা http://www.dss.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=114

জি- নিউজ বিডি ২৪ (২৪/০৩/ ২০১৩) http://www.gnewsbd24.com/gnews13/index.php?option=com_content&view=article&id=1721%3A2013-03-28-14-45-13&catid=80%3A2013-02-22-16-41-29&Itemid=1

আমার দেশ (১৪/০৪/২০১৩) http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/04/14/196425#.UWzfa6Kot48

http://www.prothom-alo.com/detail/date/2011-03-23/news/140885
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1062

http://www.prothom-alo.com/detail/date/2012-12-08/news/311487
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1062